নবীন বিজ্ঞানী

ডিসেম্বর, ২০১৯

- আধুনিক রসায়ন শিল্পের ছয়টি পর্যায়
- বিস্ময়কর কতিপয় বুদ্ধিমান প্রাণী
- জিনের কাজ করা না করা

জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

নবীন বিজ্ঞানী

জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী
ডিসেম্বর, ২০১৯ সংখ্যা

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী
সুকল্যাণ বাছাড়
কিউরেটর

মো. কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার

মো. আনিসুর রহমান
কিউরেটর (চ.দা:)

মো. মাসুদুর রহমান
সহকারী কিউরেটর

মো. মুমিনুর রশীদ
সহকারী কিউরেটর

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস
সিনিয়র আর্টিস্ট কাম-অডিও
ভিজ্যুয়াল অফিসার

রবিন বসাক
আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা/মুদ্রণালয় :
অ আ প্রিন্টার্স
বাসা ৯৫, রোড ০৪, দক্ষিণ বিশিল
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭। ফোন : ০২-৫৮১৬০৬০৯
ই-মেইল: infonmst@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.nmst.gov.bd
প্রকাশকাল : জুলাই, ২০২০

সূচিপত্র

- আধুনিক রসায়ন শিল্পের ছয়টি পর্যায় ১
  – সৌমেন সাহা
- মাল্ক-গ্রাভসের বর্জ্য:চাই বিজ্ঞানসম্মত সমাধান ১৮
  – মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
- মেন্ডেলিভ ও আন্তর্জাতিক পর্যায় সারণি বর্ষ ২১
  – জহুরুল হক বুলবুল
- বিস্ময়কর কতিপয় বুদ্ধিমান প্রাণী ২৫
  – আমিনা বেগম
- বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা ৩১
  – নিশাত বেগম
- জিনের কাজ করা না করা ৩৯
  – ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
- মাশরুম ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আশীর্বাদ ৪৩
  – হোসনে আরা পারভীন
- জর্জ কার্ভার : মাটি ও স্বজাতির প্রতি অন্তপ্রাণ এক বিজ্ঞানী ৫৩
  – ড. আমানুল ইসলাম

‘নবীন বিজ্ঞানী’-এর নিয়মাবলি

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে লেখা হতে পারে, তবে নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে। আর ভাষা সহজ-সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অনির্বাচিত লেখা ফেরত দেওয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- রচনার সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছবি দিতে হবে এবং সেসব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চায়নিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নন।
- মুদ্রণের জন্য অনুমোদিত লেখা কম্পোজ করে সংশোধনের জন্য লেখকের কাছে পাঠানো হবে।

প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক
নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৫৮১৬০৬০৯
ই-মেইল : infonmst@gmail.com, dg@nmst.gov.bd
facebook : www.facebook.com/nmstbdpg/

নবীন বিজ্ঞানী-তে বিজ্ঞাপন দিতে হলে উল্লিখিত ঠিকানায় সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মহাপরিচালকের বাণী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের নিয়মিত প্রকাশনার অংশ ত্রৈমাসিক "নবীন বিজ্ঞানী"। এবারের প্রকাশনাটির প্রেক্ষাপট সম্পূর্ন ভিন্ন। বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের কারণে বিরাজ করছে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। মানব স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ছন্দপতনে বিশ্বব্যবস্থা ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। যে অদৃশ্য ভাইরাস পৃথিবীব্যাপী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তা' মানব সভ্যতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সুবাদে যেখানে একটি মাছিও উড়ে যাওয়ার ঘটনা মানুষের চোখ এড়াতে পারে না, সেখানে এত প্রযুক্তি ও বীরত্বের দাবিদার মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে করোনা ভাইরাস। এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার অপার অনুগ্রহ চাই। এ প্রকাশনায় সম্পৃক্ত তরুণ বিজ্ঞানীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় নিজেদের নিয়োজিত করবে, প্রযুক্তিতে দেশ এগিয়ে যাবে এবং করোনা মুক্ত সভ্যতার নতুন অধ্যায় রচিত হবে। আমরা সে সোনালী দিনের অপেক্ষায়। ভবিষ্যতে প্রকাশনা আরও সমৃদ্ধকরনে পরামর্শ ও পথ নির্দেশনা কামনা করছি। অকৃত্রিম ভালবাসা সবার প্রতি।

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

আধুনিক রসায়ন শিল্পের ছয়টি পর্যায়

সৌমেন সাহা

দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে এ রকম বহু জিনিস মানুষকে তৈরি করে নিতে হয়। প্রকৃতিতে পাওয়া জিনিসগুলো অনেক সময় সরাসরি ব্যবহার করা যায় না, তা বদলে নিতে হয়। খাদ্য, ওষুধ, পোশাক, আশ্রয়, নিরাপত্তাব্যবস্থা– সবকিছুতেই এমন সব পদার্থ লাগে, যা মানুষের হাতে পরিবর্তিত হয়ে তবে কাজে লাগে। পরিবর্তন শুধু আকারে, চেহারায়, অর্থাৎ বহিরঙ্গে নয়, পরিবর্তন ঘটে পদার্থের ধর্মেও। অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করে তা কাজে লাগানো, কাঁচা খাদ্যসামগ্রীকে রান্নার মধ্য দিয়ে আহারে রূপ দেওয়া, পরিধেয় বস্ত্রকে প্রাকৃতিক রঙে রাঙানো, বিভিন্ন উপাচার-উপাদান মিশিয়ে ওষুধ তৈরি করা, সুগন্ধি তৈরি করা, কাচ ও রত্ন দিয়ে অলংকার নির্মাণ– সবকিছুতেই রসায়নের ছোঁয়া আছে।

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ রসায়নের কাজ করেছে। ছোট ছোট ক্রিয়াশালায় কারিগররা এসব কাজ করেছেন। রাজা–মহারাজা নবাব–বাদশাহরা নিজস্ব কারখানায় কাজ করিয়েছেন। তবে কোথাও বেশি পরিমাণে জিনিস তৈরি হতো না। কাঁচামালের অপ্রতুলতার কারণে, করণ–কৌশল অনুন্নত হওয়ায়, শ্রমশক্তি বেশি পরিমাণে লাগার কারণে উৎপাদিত সামগ্রী মূল্যবান হতো। তাই ধনীরা কেবল তা ব্যবহার করতে পারত। রাসায়নিক শিল্প ছিল মূলত কুটিরশিল্প, তা বৃহৎ শিল্পের রূপ পায়নি।

এই অবস্থাটা ছিল দীর্ঘকাল। মাত্র শ'দুয়েক বছর আগে পরিবর্তন আসে। কুটিরশিল্প বৃহৎ শিল্পের রূপ পায়। পৃথিবীতে বৃহৎ রাসায়নিক শিল্পের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, শিল্পবিপ্লবের সময় আর পাঁচটা শিল্পের যে ব্যাপক পরিবর্তন হয়, তার সঙ্গে রাসায়নিক শিল্পেরও পরিবর্তন ঘটে। উনবিংশ শতকের আগে কোথাও প্রকৃত অর্থে রাসায়নিক শিল্প ছিল না, যে শিল্পে হাজার হাজার টন অম্ল, ক্ষার, লবণ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে।

তার মানে এই নয় যে শিল্পবিপ্লবের আগে পৃথিবীতে ক্ষুদ্র স্তরে যে রাসায়নিক কাজ হতো তা গুণমানে নিম্ন ছিল। সেগুলো তখনকার বিচারে বেশ ভালোই ছিল। প্রদর্শনশালায় ঘুরে ঘুরে যদি আমরা মধ্যযুগ বা তারও আগের ব্যবহার্য জিনিসপত্র দেখি, তা মোটেই ফেলনা মনে হয় না। ব্রোঞ্জ ও লোহার অস্ত্রশস্ত্র, সোনা রুপা রত্নের অলংকার, চিনামাটির বাসনপত্র, রেশম পশম কার্পাসের জামাকাপড়, পাথর-মাটি-ধাতুর দেবমূর্তি– সবই বেশ উন্নত ও কাজের জিনিস ছিল। যেসব রাসায়নিক সংযোগে জিনিসপত্র তখন তৈরি হতো তা হলো– অম্ল, ক্ষার, লবণ, ধাতু, কাচ, রত্ন, ওষুধ, কাগজ, সাবান, সুগন্ধি, বারুদ, প্রসাধনী, কোহল, রং ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব হয়েছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিনের শক্তি দিয়ে। ১৭৬৪ সালে হারগ্রিভস সুতা কাটার যন্ত্র 'স্পিনিং জেনি' আবিষ্কার করেন, ১৭৬৫ সালে জেমস ওয়াট উন্নততর বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করেন, ১৭৬৫ সালে কার্টরাইট যন্ত্রচালিত তাঁত চালু করেন। দেখতে দেখতে ইংল্যান্ডে বস্ত্র

শিল্পে জোয়ার আসে। যত দিন যায় বস্ত্রশিল্পে উৎপাদন বাড়ে। ১৭৮৫ সালে যেখানে চার কোটি গজ কার্পাস বস্ত্র ইংল্যান্ডে উৎপন্ন হতো, ১৮৮৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫০ কোটি গজ। আর এসব হয়েছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা চালিত তাঁতের সাহায্যে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় কয়লার উৎপাদনও বেড়েছিল। নিউ ক্যাসেলের কয়লাখনিগুলো থেকে ১৭৮০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে কয়লার উৎপাদন বেড়েছিল ১ কোটি টন থেকে ১৫ কোটি টন। ইঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির জন্য লোহা উৎপাদনও এই সময় বেড়েছিল, ৬৮০০০ টন থেকে ৭৭৫০,০০০ টন। শিল্পবিপ্লবের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ল। পরিবহনের জন্য রেললাইন পাতা হলো, সেখানে চলল লৌহ নির্মিত রেলগাড়ি। লোহার জাহাজ জলে ভাসল, কাঠের জাহাজ ইতিহাসে আশ্রয় পেল। ইস্পাত তৈরির করণ-কৌশলও ইতিমধ্যে অনেকখানি বদলে গেল।

প্রথম পর্যায়

বস্ত্রশিল্পের উন্নতির ফলে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি হলো। প্রাচীনকাল থেকে তাঁতে কাপড় বোনার কাজের সঙ্গে কয়েকটা জিনিস সম্পৃক্ত ছিল। যেমন, সাবান, বিরঞ্জক (bleaching agent), রং (dye), পাকা রং ধরানের জন্য প্রয়োজনীয় ফটকিরি লবণ (mordant) প্রয়োজন হতো। সাবান তৈরি হতো চর্বি, উদ্ভিজ্জ তেল আর ক্ষার দিয়ে। বিরঞ্জক তৈরির জন্যও ক্ষার দরকার হতো। প্রাক্-শিল্পবিপ্লব যুগে বিরঞ্জনের জন্য স্কটল্যান্ডের তাঁতিরা একটা অভিনব পন্থা গ্রহণ করত। তৈরি কাপড়গুলোকে তাঁতিরা হল্যান্ডে (নেদারল্যান্ডস) পাঠিয়ে দিত। হল্যান্ডে দুগ্ধশিল্প উন্নত ছিল। তারা প্রচুর পরিমাণে দুধ উৎপন্ন করত। অতিরিক্ত দুধ নষ্ট হয়ে টকে যেত। এতে থাকত ল্যাকটিক অ্যাসিডসহ নানা জৈব অ্যাসিড। পোড়া উদ্ভিদের ছাই মেশানো পানিতে ও টোকো দুধে কারিগরেরা পালা করে কাপড়গুলো ফোটাত এবং রোদে শুকাত। ধীরে ধীরে কাপড়ের মালিন্য চলে যেত, কাপড় শুভ্র হয়ে যেত। পোড়া উদ্ভিদের ছাইয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষার থাকে, আর টোকো দুধে থাকে অ্যাসিড। টোকো দুধের বদলে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করে কারিগরেরা দেখল যে তাতেও কাজ হচ্ছে এবং দ্রুত হচ্ছে। বিরঞ্জনের কাজের জন্য সালফিউরিক অ্যাসিডের চাহিদা বাড়ল। অর্থাৎ বস্ত্রশিল্পের উন্নতি একই সঙ্গে ক্ষার, সালফিউরিক অ্যাসিড, সাবান, রং প্রভৃতির চাহিদা বাড়িয়েছিল। এ সময় কাচ তৈরিও বেড়েছিল। ফলে ক্ষারের প্রয়োজনও বাড়ল, কারণ বালু ও ক্ষার হলো কাচ তৈরির প্রধান উপাদান। এতকাল যে পদ্ধতিতে এগুলো তৈরি হতো, দেখা গেল তা আর কার্যকরী নয়।

ক্ষার পাওয়া যেত বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ পুড়িয়ে। মিসরের 'ট্রোনা' নামের একধরনের লবণে ক্ষারের গুণ আছে, এটা সোডিয়াম সেসকুইকার্বোনেট। ইংল্যান্ডের কারিগরেরা অনেক দাম দিয়ে 'ট্রোনা' আমদানি করত। ব্যারিল্লা নামের একধরনের উদ্ভিদ (saltworts) পুড়িয়ে সোডা পাওয়া যেত। মাদ্রাজের কাছে এ রকম উদ্ভিদ প্রচুর জন্মাত। ভারতে আগত ইংরেজ অনুসন্ধানকারীরা (যেমন W. Roxburgh) মনে করতেন যে ভারতীয় ব্যারিল্লা দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর সাবান ও কাচ তৈরি করা সম্ভব। সিন্ধু প্রদেশে 'লানি' নামের এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মাত। বিশেষ করে কচ্ছ এলাকায় জন্মানো লানি পুড়িয়ে বছরে প্রায় পাঁচ হাজার মণ সোডা পাওয়া যেত। দক্ষিণ ফ্রান্সেও ব্যারিল্লা পাওয়া যেত। কিছু সামুদ্রিক উদ্ভিদকে (kelp) পুড়িয়ে ক্ষার উৎপন্ন করত ইংরেজরা। কিন্তু চাহিদার তুলনায় ব্যারিল্লার সরবরাহ সব সময় কম হতো।

অষ্টাদশ শতকেই সমস্যাটা বোঝা যাচ্ছিল এবং অজৈব পথে ক্ষার তৈরি করার উদ্যোগ রসায়নবিদদের

মধ্যে দেখা গেল। ফ্রান্সের একাডেমি অব সায়েন্স এ নিয়ে একটা পুরস্কার ঘোষণা করল। ১৭৭২ সালে রসায়নবিদ শিলি (Scheele) দেখেন যে সোডিয়াম ক্লোরাইডকে লিথার্জ (লেড অক্সাইড) দিয়ে উত্তপ্ত করলে কস্টিক সোডা পাওয়া যায়। ফাদার ম্যালসেরবে (Malecherbe) পদ্ধতির কিছুটা অদল-বদল করেন, তিনি সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিবর্তে সোডিয়াম সালফেট, লিথার্জের পরিবর্তে লোহাচুর ব্যবহার করেন, সঙ্গে কয়লা বা কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে উত্তপ্ত করেন। এতে কস্টিক সোডা পাওয়া গেল বটে, তবে পড়তায় বেশি দাম পড়ল। এই সময় নিকোলাস লে ব্লাঙ্ক (Nicholas Lc Blanc) (পাশের চিত্র) নামের ফ্রান্সের একজন চিকিৎসক কাজটায় নামলেন। ১৭৮৪ সালে তিনি কাজে নামেন এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর পরিশ্রমের পর সফল হন। আবিষ্কৃত হয় লে ব্লাঙ্ক পদ্ধতিতে সোডা উৎপাদন।

প্রথমে লে ব্লাঙ্ক সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সামুদ্রিক লবণের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া করিয়ে সোডিয়াম সালফেট তৈরি করেন। তারপর এর সঙ্গে গুঁড়ো কাঠকয়লা ও চুনাপাথর মিলিয়ে উত্তপ্ত করেন। এই বিক্রিয়ায় কাঠকয়লা সোডিয়াম সালফেটকে বিজারিত করে সোডিয়াম সালফাইড উৎপন্ন করে, পরে তা ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম কার্বোনেট তৈরি করে। পানি দিয়ে তাকে ধুইয়ে দিলে সোডিয়াম কার্বোনেটের দ্রবণ পাওয়া যায়। দ্রবণকে বাষ্পীভূত করলে কাপড় কাচা সোডার কেলাস উৎপন্ন হয়। লে ব্লাঙ্ক পদ্ধতিটির পেটেন্ট নেন এবং ১৭৯১ সালে ফ্রান্সে একটা সোডার কারখানা স্থাপন করেন। বছরে ৩২০ টনের মতো সোডা উৎপন্ন হতো। ফরাসি বিপ্লবের গোলমালের মধ্যে লে ব্লাঙ্কের কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আর কারখানা চালু করতে পারেননি। একাডেমির পুরস্কারটাও পাননি। অবশেষে হতাশ লে ব্লাঙ্ক ১৮০৬ সালে আত্মহত্যা করেন।

ফ্রান্সে লে ব্লাঙ্ক পদ্ধতি চালু হলেও ইংল্যান্ডে কিন্তু তা চালু হতে দেরি হয়েছিল। তারা উদ্ভিজ্জ সোডা নিয়েই কাজ করত। তারপর আস্তে আস্তে ছোট ছোট কারখানায় লে ব্লাঙ্ক পদ্ধতি অনুকরণ করে সোডা তৈরি শুরু হয়। লে ব্লাঙ্ক পদ্ধতির জন্য যথেষ্ট সালফিউরিক অ্যাসিড দরকার হতো। বস্ত্র-বিরঞ্জনের জন্যও সালফিউরিক অ্যাসিড দরকার হতো। অনেক দিন আগে থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের একটা পদ্ধতি চালু ছিল। হিরাকস (copperas) নামে একটা খনিজকে উত্তপ্ত করলে সালফিউরিক অ্যাসিড হতো। হিরাকস বেশি পাওয়া যেত না। তাই অ্যাসিডের সরবরাহও ছিল কম। ওষুধপত্রে যতটুকু অ্যাসিড লাগত, তা এভাবে উৎপন্ন হতো। সাধারণত মধ্য ইউরোপে, বিশেষ করে স্যাক্সনি, বোহেমিয়ায় অ্যালকেমিস্টরা হিরাকস থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড বানাত। অ্যাসিডটা ঘন ও ধূমায়িত প্রকৃতির হতো। তাই একে fuming অ্যাসিড বলা হতো। বাজারে এটা Nordhausen অ্যাসিড নামেও পরিচিত ছিল। সপ্তদশ শতকে তখনকার জার্মানিতে এভাবে অ্যাসিড তৈরি হলেও ও দেশের 'ত্রিশ বছরের যুদ্ধ' সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে হাজার হাজার টন সালফিউরিক অ্যাসিড কীভাবে উৎপন্ন হলো? সেটাও হয়েছিল একটা পুরোনো পদ্ধতির আধুনিকীকরণের ফলে।

তত দিনে জানা গিয়েছে যে নীল রং (indigo) সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে পশমের কাপড়ে লাগালে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। অ্যাসিডটার আর একটা বাজার তৈরি হলো। অ্যাসিডের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্বিতীয়

পদ্ধতির দিকে নজর পড়ল। অনেক দিন ধরে জানা ছিল, গন্ধকচূর্ণ আবদ্ধ পাত্রে জ্বালিয়ে রেখে দিলে পাত্রস্থ পানি ধীরে ধীরে সালফিউরিক অ্যাসিড হয়। অষ্টাদশ শতকে এই পদ্ধতির উন্নতি ঘটানো হলো। পানি, সোরা, গন্ধক একত্রে বদ্ধ পাত্রে নিয়ে সোরা ও গন্ধক জ্বালিয়ে ফেলে রাখলে ক্রমে পানি সালফিউরিক হলো। জোশুয়া ওয়ার্ড নামের এক চিকিৎসক মাটির পাত্রটা বদলে কাচের পাত্র নিলেন, উৎপাদন বাড়ল। অষ্টাদশ শতকের শেষে তা–ও বদলে এলো সিসার তৈরি বড় বড় জার। উৎপাদন আরও বাড়ল। বার্মিংহামে ডা. জন রোবাক (John Roebuck) ১৭৪৬ সালে সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা বানিয়ে ফেললেন। সঙ্গী ছিলেন গারবেট (Garbett) নামে এক শিল্পপতি। বছর তিনেক পর তাঁরা আইনগত সমস্যায় পড়ে স্কটল্যান্ডে গিয়ে কারখানা গড়েন। এখানে কারখানার নাম হয় Prestonpans Vitriol Company। এটাই বিশ্বের প্রথম বৃহদাকার রাসায়নিক শিল্প। ১৮০০ সালের মধ্যে কারখানায় ১০৮টা সিসার চেম্বার তৈরি হলো। চেম্বারগুলো ৬০,৪৮০ কিউবিক ফিট সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করত। ব্রিটেনে কিন্তু সোরা বা গন্ধক পাওয়া যেত না, এগুলো তারা আমদানি করত। ভারত থেকে যেত সোরা, সিসিলি থেকে যেত গন্ধক। ভারত থেকে যত সোরা যেত তার সিংহভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড বানাতে লাগত, বাকিটা বারুদ তৈরির কাজে নেওয়া হতো। ব্রিটেনে প্রথম দিকে ওই সব আমদানির ওপর ভালো শুল্ক দিতে হতো, ১৮৫৩ নাগাদ আমদানি শুল্ক কমে গেলে আমদানি বেড়ে যায়, রাসায়নিক শিল্পগুলোও বিস্তৃত হতে থাকে।

বস্ত্র-বিপ্লবের যুগে তৃতীয় যে জিনিসটার উৎপাদন বাড়ল তা হলো ব্লিচিং পাউডার। গোড়ার দিকে বিরঞ্জক হিসেবে ব্লিচিং পাউডার জানা ছিল না। সে কাজ ওলন্দাজ দুধওয়ালারা করত, যার সম্পর্কে আগে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৭৭০ সাল নাগাদ শিলি ক্লোরিন আবিষ্কার করেছেন। অচিরে ক্লোরিনের বিরঞ্জন ক্ষমতা জানা গেল। কিন্তু দেখা গেল যে ক্লোরিন বিরঞ্জন করলেও কাপড়ের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তখন ক্লোরিনযুক্ত যৌগের খোঁজ পড়ল। চুনের গোলার মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস চালিয়ে উপযুক্ত বিরঞ্জক ব্লিচিং পাউডার পাওয়া গেল। চার্লস টেন্নান্ট (Charles Tennant) (পাশের চিত্র) কাপড়ের বিরঞ্জনের কাজে জিনিসটা প্রয়োগ করলেন, সাফল্যও এলো। ১৭৯৭ সালে তিনি ব্লিচিং পাউডারের পেটেন্ট গ্রহণ করলেন। পরে জিনিসটার আরও উন্নতি ঘটিয়েছিলেন টেন্নান্ট।

ক্ষার ও ব্লিচিং পাউডারের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে আরও তিনটি রাসায়নিক শিল্প বিস্তৃত হলো। এগুলো হলো কাগজ, সাবান ও কাচশিল্প। বস্ত্রশিল্পের মতো কাগজ শিল্পেও প্রচুর বিরঞ্জকের প্রয়োজন হতো। তাছাড়া ক্ষার এই তিনটি শিল্পেরই গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। কাগজ যেমন জৈব রঙের প্রসারের জন্য দায়ী (রঙিন কাগজ তৈরি করার জন্য), তেমনি কাচে রং ধরানোর জন্য দায়ী নানা অজৈব রঙিন পদার্থ (কোবাল্ট অক্সাইড, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, ফেরিক অক্সাইড, আলট্রামেরিন, ক্রোমিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি)। অর্থাৎ কাগজ ও কাচশিল্পের প্রসার একই সঙ্গে জৈব ও অজৈব রঙের উৎপাদন বাড়িয়ে দিল।

ওদিকে লে ব্লাঙ্কের পদ্ধতির থেকে উন্নত একটা পদ্ধতি এসে ক্ষারের (সোডা অ্যাশ) উৎপাদন বাড়িয়ে দিল। আগস্টিন জাঁ ফ্রেসনেল নামে এক রসায়নবিদ আবিষ্কার করেন যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের এক সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে অ্যামোনিয়াম বাইকার্বোনেট বিক্রিয়া করলে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটের অধঃক্ষেপ পড়ে।

এই অধঃক্ষেপকে উত্তপ্ত করলে তা ভেঙে সোডিয়াম কার্বোনেট হয়। কিন্তু জিনিসটা কোনো শিল্পে করা যাচ্ছিল না। অতঃপর বেলজিয়ামের দুই ভাই আর্নেস্ট সলভে ও আলফ্রেড সালভে ১৮৭০ সালে একটা কারখানা গড়ে কাজটা করতে পারলেন। শুরু হলো সোডা অ্যাশ উৎপাদনের অ্যামোনিয়া-সোডা পদ্ধতি বা সলভে পদ্ধতি। ১৮৭৩ সালে লুডভিগ মন্ড (Lodbig Mond) ও জন ব্রুনার (John Brunner) একত্রে ইংল্যান্ডে সলভের অনুমতি নিয়ে একটা কারখানা গড়েন। এখানে তাঁরা সলভে পদ্ধতিতে একাধিক্রমে আট বছর সোডা উৎপন্ন করেন। যে সময়কার কথা বলছি তখন কয়লাকে আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করলে (অন্তর্ধূম পাতন) যে গ্যাস বের হতো তার অন্যতম উপাদান ছিল অ্যামোনিয়া। সেই অ্যামোনিয়া সংগ্রহ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মিশিয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে পাঠানো হতো। এভাবে প্রথম পর্যায়ে বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে সালফিউরিক অ্যাসিড, ক্ষার, ব্লিচিং পাউডার, কাচ, কাগজ, সাবান ইত্যাদি রাসায়নিক শিল্প গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আলোচ্য সময়কাল গেছে। এই সব রাসায়নিক আরও কয়েকটি রাসায়নিক শিল্পকে গড়ে তোলে। যেমন, সালফিউরিক অ্যাসিড গড়ে তোলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের শিল্প, সুপার ফসফেট সারশিল্প। অ্যাসিডগুলো বেশ কয়েকটা লবণের শিল্প গড়ে তোলে।

দ্বিতীয় পর্যায়

এরপর শুরু হলো দ্বিতীয় পর্যায়। কয়লাকে কেন্দ্র করে এই পর্যায় আরম্ভ হয়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে উনবিংশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে এর শুরু। ইংল্যান্ডসহ ইউরোপে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার আগেই শুরু হয়েছিল। এতদঞ্চলে কয়লা মাটির বেশি নিচে থাকে না। শ্রমিকেরা সহজেই কয়লা উত্তোলন করতে পারেন। ইংল্যান্ডে কয়লাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার শুরু হয় ১৬১৮ সালে। এই সময় কাঠকয়লা কমে যাওয়ায় ডুডলে (Dudley) নামের একজন কারিগর লৌহ আকরিক থেকে লোহা উৎপাদনের কাজে কয়লা ব্যবহার করেন। গোটা সপ্তদশ শতক ধরে কয়লার এই ব্যবহার ইংল্যান্ডসহ গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। কয়লা-জ্বালানির উন্নতি ঘটান আব্রাহাম ডারবি (Abrahum Darby) নামের আরএক লৌহ-কারিগর। তিনি ১৭৭৩ সালে কাঁচা কয়লার বদলে পোড়া কয়লাকে (coke) জ্বালানি করলেন এবং দেখলেন যে লৌহ বিজারণের কাজটা আরও ভালোভাবে হচ্ছে। পোড়া কয়লা তৈরি করার পেটেন্ট ১৬২০ সালে পেয়েছিলেন উইলিয়াম সেন্ট জন। তিনি একটা আবদ্ধ পাত্রে কয়লা ভরে বাইরে থেকে প্রচণ্ড উত্তাপ দিতেন। তার ফলে কোল গ্যাস বের হতো, গ্যাস থেকে চটচটে ঘন আলকাতরা পাওয়া যেত, পাত্রে পড়ে থাকত পোড়া কয়লা ও কোক। কোক দিয়ে জ্বালানি হতো, আলকাতরা অপ্রয়োজনীয় ভেবে ফেলে দেওয়া হতো। কোল গ্যাসকে জ্বালানি হিসেবে প্রথম কাজে লাগান উইলিয়াম মারডক (Murdock)। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ১৮১২ সালে কোল গ্যাস দিয়ে লন্ডন শহরের পথ আলোকিত করা হয়।

জার্মানরা প্রথম আলকাতরা কাজে লাগায়। ১৮৪৫ সাল নাগাদ জার্মানরা বাড়ির ছাদ থেকে পানি চোঁয়ানো আটকাতে ছাদে আলকাতরার প্রলেপ দেয়। পানি চোঁয়ানো ঠেকাতে কাঠের জাহাজের তলায় আলকাতরা লাগানো হয়েছিল। দেখতে দেখতে ইংল্যান্ডে, ইউরোপে ও আমেরিকায় কোক ওভেন ব্যাটারিগুলো গড়ে ওঠে। নানা কাজে আলকাতরা ও জ্বালানি হিসেবে কোক ও কোল গ্যাস ব্যবহার করা হতে থাকে। তখন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ চলছে। এর পরেই আসে কয়লাতে উপস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিকের আত্মপ্রকাশ।

আলকাতরা থেকে তৈরি হয় বিভিন্ন রং, ওষুধ, সুগন্ধি, রেজিন, রাবার-রাসায়নিক, পিচ, বিবিধ জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এর প্রতিটি জিনিস মানুষের কাজে লেগেছে, জীবনযাত্রাকে উন্নত থেকে উন্নততর করেছে। কোল গ্যাস থেকেও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থসহ অ্যামোনিয়া পাওয়া গেছে। কোল গ্যাসের শীতলীভবন করলে বেশ কিছু রাসায়নিক পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে পিরিডিন, বেঞ্জিন, টলুইনি, জাইলিন, ন্যাপথালিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক টন কয়লা থেকে প্রায় সাড়ে তিন গ্যালন পরিমাণ ওই সব রাসায়নিক মেলে। টনপ্রতি কয়লা থেকে ৮-১২ গ্যালন আলকাতরা পাওয়া যায়।

কয়লার মধ্যে পাওয়া রাসায়নিকগুলো অধিকাংশ জৈব প্রকৃতির। জৈব রসায়নে বিজ্ঞানীরা যত দিন না প্রাথমিক বুৎপত্তি অর্জন করেছেন, তত দিনে তাঁদের পক্ষে কয়লা ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। এই শতাব্দীর প্রথম অংশটা গেছে সেই জৈব রসায়ন বুঝতে–জানতে। জ্যাকব বার্জেলিয়াস কাজটা শুরু করেছিলেন। তাঁর আগে জৈব পদার্থ (অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণিজাত পদার্থ) সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিশেষ কিছু জানতেন না। ডাক্তারি জানা ছিল বলে বার্জেলিয়াস পিত্তরস, রক্ত নিয়ে কাজ শুরু করলেন। কাজ করতে করতে তিনি একদিন জৈব অ্যাসিড পাইরুভিক অ্যাসিড আবিষ্কার করলেন। জৈব পদার্থে থাকে কার্বন। আর কোথাও আছে হাইড্রোজেন, কোথাও অক্সিজেন। কোথাও নাইট্রোজেন বা ফসফরাস বা গন্ধক। ওজনভিত্তিক পরীক্ষাগুলো বিশুদ্ধ জৈব পদার্থের উপাদানগুলোর ওজন বের করল, তারপর নির্ণয় করল তাদের আণবিক সংকেত। বার্জেলিয়াস দেখলেন, একই আণবিক সংকেত নিয়ে একাধিক পদার্থ পাওয়া সম্ভব। তাই জৈব অণুর সংখ্যা খুব বেশি। এমন অদ্ভুত ব্যাপার অজৈব রাসায়নিকের বেলায় ঘটে না। বার্জেলিয়াসের ছাত্র ফ্রেডরিখ হোলার অজৈব পদার্থ থেকে একটা জৈব পদার্থ তৈরি করে ফেললেন। বিপ্লব ঘটে গেল যেন। আরও আরও জৈব পদার্থ তৈরি করলেন কোলবে, ফন লিবিগ, মার্সিলিন বার্থেলো। ক্রমশ বোঝা গেল, পৃথিবীতে অজৈব পদার্থের তুলনায় জৈব পদার্থের সংখ্যা বেশি। এদের পাওয়া যায় জীবিত এবং মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে। কয়লা তৈরি হয়েছে উদ্ভিদ ধ্বংস হয়ে। তাই কয়লার মধ্যে জৈব পদার্থ পাওয়া সম্ভব– এমনটা অনুমান করলেন জৈব রসায়নবিদেরা। ইতিমধ্যেই কোল গ্যাস, আলকাতরা থেকে বেশ কিছু জৈব পদার্থের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল। ওষুধের জন্যও কয়লার দিকে নজর পড়ল। এর কারণও ছিল। উদ্ভিজ্জ ওষুধগুলোর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক, কি খনিজ, কি ধাতব, কি জৈব প্রকৃতির ওষুধের ব্যবহার এ সময় থেকে শুরু হয়ে গেছে।

আলকাতরা (coal tar) একটা ঘন কালচে বাদামি রঙের দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ। এটাকে অংশ-পাতন করলে বেঞ্জিন, টলুইন, জাইলিন, কার্বলিক অ্যাসিড, ন্যাপথালিন, অ্যানথ্রাসিন এবং আরও অনেকগুলো জৈব পদার্থ পাওয়া যায়। শেষে পড়ে থাকে পিচ। পিচ রাস্তা তৈরি, ছাদ মেরামত ও অন্যান্য কাজে লাগে। ব্রিটেনের নিউ ক্যাসেলে, জার্মানির রুর অঞ্চলে, আমেরিকার পেনসিলভানিয়াতে যেখানে যেখানে কয়লা পাওয়া যেত, সেখানেই কয়লা-শিল্প স্থাপিত হলো। কোক, কোল টার, আলকাতরা ইত্যাদির বাজার ছিল বলেই কয়লাশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব অঞ্চলে কয়লার ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছাদিত থাকত। পরিবেশ সম্পর্কে কোনো সচেতনতাই ছিল না।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল। ব্রিটেনে উইলিয়াম পারকিন নামের এক তরুণ রসায়ন পড়তে এলেন লন্ডনের রয়্যাল কলেজ অব সায়েন্সে। সেখানে রসায়ন পড়াতেন এক জার্মান সাহেব– ফন হফম্যান।

হফম্যান ছিলেন জার্মান জৈব রসায়নবিদ ফন লিবিগ-এর ছাত্র। হফম্যান আলকাতরা নিয়ে গবেষণা করতেন। আলকাতরার মধ্যে নানান জৈব পদার্থ আছে, এটা তত দিনে পরিষ্কার হয়েছে। পারকিন ভাবলেন যে আলকাতরা থেকে কুইনিন বানাবেন। ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে কুইনিনের তখন বেশ চাহিদা ছিল। এটাকে একমাত্র কুইনিন গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কেন যে কুইনিন বানাতে পারকিন আলকাতরাকে বেছে নিয়েছিলেন, তা জানা নেই। কুইনিন যে ভীষণ জটিল যৌগ, তা–ও পারকিন বোঝেননি। আলকাতরা নিয়ে কাজ করতে করতে পারকিন হঠাৎই বেগুনি রঙের একটা পদার্থ পেয়ে গেলেন। সেটা ১৮৫৬ সাল। বন্ধুদের পরামর্শে পারকিন বেগুনি রঙের জিনিসটা কাপড়ের কারখানায় পাঠিয়ে দিলেন। দেখা গেল, কাপড় রাঙানোর কাজে ওটা চমৎকার সফল। কারখানা থেকে জানতে চাইল– পারকিন কি ওরকম আরও রং পাঠাতে পারে?

তখন পর্যন্ত কাপড় রং করার কাজ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ রং দিতেই হতো। নীল, লাল, খয়েরি, কালো, হলুদ-সব রংই প্রকৃতির থেকে পাওয়া। প্রাচ্য দেশগুলো, বিশেষ করে ভারত থেকে নানান রং ইউরোপের বাজারে যেত। পারকিন উৎসাহী হয়ে আরও রং বানাতে শুরু করলেন। 'অ্যানিলিন পারপল' নামে যে রংটা বানালেন, তার সমতুল্য রং প্রকৃতিতে পাওয়া যেত না। দেখতে দেখতে পারকিনের সাফল্য ইউরোপ ছড়িয়ে পড়ল। ফরাসি ও জার্মানরা এ কাজে সব থেকে এগিয়ে গেল। ফরাসিরা আলকাতরা থেকে অনেকগুলো বেগুনি রং বানাল, নাম দিল 'মভ' রং। হফম্যান নিজেও কয়েকটা রং বানালেন। একটা লাল রং তাঁর হাতে তৈরি হলো- নাম দেওয়া হলো 'ম্যাজেন্টা'। তৈরি হলো 'হফম্যান-ভায়োলেট'। প্রাকৃতিক রংগুলোও বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে বানালেন। পারকিন মঞ্জিস্ট রং (অ্যালিজারিন) বানালেন, বায়ার বানালেন নীল (ইন্ডিগো)। পারকিন গবেষণার কাজ ছেড়ে রঙের কারখানা স্থাপন করলেন। ব্যবসা দ্রুতগতিতে এগোতে থাকল। পারকিন খুব কম বয়সেই বেশ ধনী হয়ে গেলেন। ১৮৫৬ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে আধুনিক রংশিল্প তৈরি হলো। এসব শিল্পের কাঁচামাল হলো আলকাতরা। কিন্তু ব্রিটেন রংশিল্পের নেতৃত্ব রাখতে পারল না। জার্মানরা এ ব্যাপারে এগিয়ে গেল। ১৯১৩ সালের একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে গোটা পৃথিবী সে বছরে ১৬২,০০০ টন কৃত্রিম রং ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে জার্মানি একাই তৈরি করেছে ১৩৫,০০০ টন। প্রায় হাজার খানেক রাসায়নিক রং বাজারে চলে এলো। যে রাসায়নিকগুলো থেকে রং উৎপাদন করতে হয় সেই 'অন্তর্বর্তীগুলো' (intermediates), যেমন অ্যানিলিন, ক্রেসল, নাইট্রোবেঞ্জিন, ফেনল, থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড, সাইক্লোহেক্সেন, স্টাইরিন ক্লোরোবেঞ্জিন ইত্যাদির উৎপাদন বাড়ল, অর্থাৎ একটা বড় জৈব রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠল। ইতিমধ্যে আলকাতরা-জাত রংগুলোর আর একটা গুণ ধরা পড়েছে। কাপড় রাঙানোর কাজ ছাড়া তারা ওষুধ হিসেবেও কার্যকরী, এটা চিকিৎসকেরা লক্ষ করেছেন। পল এরলিচ (Paul Ehrlich) দেখলেন যে, অ্যানিলিন থেকে তৈরি রংগুলো কোন কোন ব্যাকটেরিয়াকে রঞ্জিত করে এবং তারপর তাদের মৃত্যু ঘটায়। ব্যাকটেরিয়া দিয়ে রাঙিয়ে নিলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তাদের ভালোভাবে 'দেখা' সম্ভব হয়। ১৮৮২-তে এরলিচ যক্ষ্মার ব্যাকটেরিয়াকে আলকাতরার রং দিয়ে ধ্বংস করতে সক্ষম হন। অ্যান্টিবায়োটিকের সেটাই শুরু।

কোকের ব্যবহারও বাড়ছিল। ধাতু নিষ্কাশন শিল্পে উন্নত মানের কোকের চাহিদা ছিল। ইস্পাত তৈরির নতুন নতুন পদ্ধতি শতাব্দীর মাঝামাঝি আবিষ্কৃত হলো। লৌহশিল্প ক্রমশ বিস্তৃত হলো। আর সে কারণে কয়লা হলো নানান শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল।

তৃতীয় পর্যায়

উনবিংশ শতকে অনেকগুলো যুদ্ধ হয়। কামান, বন্দুকে লাগত বারুদ। বারুদ আবিষ্কার করেছিল চীনারা। দীর্ঘকাল যাবৎ বারুদ ছাড়া অন্য কোনো বিস্ফোরক বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেননি। বারুদের উপাদানের উন্নতি ঘটিয়ে তাঁরা বারুদ আরও কার্যকরী করতেন মাত্র। জৈব রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন বিস্ফোরক তৈরির একটা চেষ্টা হলো। সাফল্যও এলো। গড়ে উঠল 'বিস্ফোরক শিল্প' (Explosive Industry)। এই শিল্পের সঙ্গে আলফ্রেড নোবেলের নাম জড়িয়ে গেল। বিস্ফোরক শিল্প শুধু যুদ্ধকে প্রভাবিত করল না, পাশাপাশি পাহাড়, পাথর ফাটিয়ে নতুন পথ তৈরি করতে সাহায্য করল। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকায় রেলপথ, সড়কপথ তৈরি করতে বিস্ফোরকের প্রশংসনীয় ভূমিকা আছে।

'রংশিল্প' ও 'বিস্ফোরক শিল্প' প্রায় একই সময় ইউরোপে বিস্তৃত হয়। রংশিল্পে যেসব কাঁচামাল লাগে, যে কাঁচামাল 'অন্তর্বর্তীগুলো' (intermediates) উৎপাদন করে, যা পরে রঙে পরিবর্তিত হয়, তা দিয়ে বিস্ফোরকও তৈরি হয়। যে বেঞ্জিন, টলুইন থেকে রং হয়, তাই দিয়ে পিকরিক অ্যাসিড, টিএনটি (trinitrotoluene), ট্রেট্রাইল বানানো যায়। নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রেট লবণ একই সঙ্গে রং ও বিস্ফোরক উৎপাদন করতে লাগে। রং ও বিস্ফোরক শিল্পে নানান অজৈব রাসায়নিকও লাগে। ফলে উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বিভিন্ন খনিজ অ্যাসিড, বিভিন্ন ক্ষার, লবণ ও কয়েকটা মৌলিক পদার্থের উৎপাদন বেড়ে গেল।

বারুদের সক্রিয়তার মূল কারণ সোরা (পটাশিয়াম নাইট্রেট)। সোরা উত্তপ্ত হলে দ্রুত অক্সিজেন নির্গমন করে। অক্সিজেন বারুদের অন্য উপাদান কার্বন ও গন্ধককে পুড়িয়ে তাদের অক্সাইড উৎপন্ন করে। অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে। এই তাপ শক্তি হলো বারুদের বিস্ফোরণ শক্তি। কিন্তু নতুন বিস্ফোরকগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই রাসায়নিকগুলোর মধ্যে যে রাসায়নিক বন্ধনীগুলো আছে, তা থেকে যাবতীয় শক্তি আসে। বিস্ফোরকগুলোকে চাপ দিলে বা আগুন দিলে ওই রাসায়নিক বন্ধনীগুলো ছিন্ন হয়ে যায়। তার ফলে প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়।

১৮৪৫ সালে এক জার্মান রসায়নবিদ ক্রিশ্চিয়ান স্কনবিয়েন (Schonbein) (পাশের) ঘটনাচক্রে নতুন ধরনের বিস্ফোরক প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি সেলুলোজ (কাপড়ের টুকরো) ও নাইট্রিক অ্যাসিড-সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ অজান্তে বিক্রিয়া করান। এর ফলে সেলুলোজের হাইড্রোক্সিল ও নাইট্রেট যুক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ সেলুলোজের নাইট্রেশন হয়। স্কনবিয়েন বুঝতেই পারেননি যে উৎপাদিত জিনিসটা একটা বিস্ফোরক। কাপড়টা উনুনের ওপর শুকোতে দেওয়া মাত্র সেটা সশব্দে ফেটে গেল। বিজ্ঞানীরা বিস্ফোরকটার নাম দিলেন নাইট্রোসেলুলোজ বা 'গানকটন'। চারদিকে গনকটন তৈরির ধুম পড়ে গেল। তাতে যত না গানকটন তৈরি হলো তার থেকে বেশি বিস্ফোরক ফেটে দুর্ঘটনা ঘটল। মানুষজন মারাও গেল। জানা গেল, গানকটনে থেকে যাওয়া সামান্য অশুদ্ধি জিনিসটার হঠাৎ করে ফেটে যাওয়ার কারণ। গানকটন নিরাপদে ব্যবহার করার পথও তাঁরা খুঁজে পেলেন। তবে এর মধ্যে অন্য ব্যবস্থা হওয়ায় ব্যাপারটা বদলে গেল।

গানকটন আবিষ্কারের পরের বছর একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী আসকানিও সব্রেতো (Sobreto) গ্লিসারিনকে (যার মধ্যে হাইড্রোক্সিল আছে) একইভাবে নাইট্রেশন করে খুব শক্তিশালী বিস্ফোরক নাইট্রোগ্লিসারিন তৈরি করেন। এর শক্তি দেখে নামকরণ হলো blasting oil। যখন-তখন নাইট্রোগ্লিসারিন ফেটে যেত। তখন আলফ্রেড নোবেল (১৮৩৩-১৮৯৬) (পাশের চিত্র) মঞ্চে পদার্পণ করলেন। কাইসেলগুর (Kieselguhr) নামের একধরনের খনিজ বা মাটি এই নাইট্রোগ্লিসারিনকে শোষণ করতে পারে, এটাই নোবেলের আবিষ্কার। কাইসেলগুরে শোষিত নাইট্রোগ্লিসারিনে যখন-তখন বিস্ফোরণ ঘটে না, তবে উপযুক্ত পদ্ধতিতে উদ্দীপিত করলে তা ভীষণ শব্দসহ বিস্ফোরিত হয়। নাইট্রোগ্লিসারিনের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনমাফিক বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করেছিলেন আলফ্রেড নোবেল। এটাই তাঁর বড় কৃতিত্ব। কাইসেলগুরে শোষিত নাইট্রোগ্লিসারিনকে 'ডিনামাইট' বলে। ডিনামাইট ফাটানোর জন্য দুটি উদ্দীপকও তিনি আবিষ্কার করলেন। এগুলো মারকারি ফালমিনেট ও লেড অ্যাজাইড। উদ্দীপক দুটিকে detonator বলে। এগুলো নিজেও বিস্ফোরক। ডেটোনেটরকে তাপ বা আঘাত দিলে তা ফেটে যায় এবং পরে নাইট্রোগ্লিসারিনকে ফাটিয়ে দেয়।

নাইট্রোসেলুলোজ, নাইট্রোগ্লিসারিন ও পেট্রোলিয়াম জেলি মিশিয়ে একটা জেলি বানানো যায়। এটাও খুব শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ, নাম 'ব্যালিস্টাইট', 'জিলাটিন ডিনামাইট'। ১৮৮৭ সালে আলফ্রেড নোবেল 'জিলাটিন ডিনামাইটের' পেটেন্ট নেন। এরপর বছর দুই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডিউয়ার (Dewar) এবং অ্যাবেল (Abel) 'কর্ডাইট'-এর পেটেন্ট নেন। কর্ডাইট দুটি বিস্ফোরক নাইট্রোসেলুলেজ ও নাইট্রোগ্লিসারিনের ভেসলিনে মিশ্রণ। কর্ডাইটের রজ্জুর ব্যাস কমিয়ে বাড়িয়ে পলতের আগুন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এগুলো সবই ধূম্রহীন বিস্ফোরক।

১৮৭০ সালে আলফ্রেড নোবেল কাইসেলগুরে নাইট্রোগ্লিসারিন সংরক্ষণ ও দুটি উদ্দীপক আবিষ্কার করেন। এর এক বছর পর তাঁর আবিষ্কারকে ব্যবহার করে স্কটল্যান্ডে প্রথম বিস্ফোরকের কারখানা স্থাপিত হয়। সহযোগী ছিলেন বিখ্যাত রাসায়নিক শিল্পপতি চার্লস টেন্নান্ট (Charles Tennant)। স্থাপিত হলো ব্রিটিশ ডিনামাইট কোম্পানি লিমিটেড। শুধু স্কটল্যান্ডে নয়, ইউরোপের অন্যত্রও নোবেলের অনুমতি সাপেক্ষে ডিনামাইটের কারখানা গড়ে ওঠে। প্রথম বিশ বছর ডিনামাইট মানব-উন্নয়নের কাজে শুধু ব্যবহৃত হতো। পাহাড়, পাথর, খনি ফাটানোর কাজ করত ডিনামাইট। ব্যবসা করে আলফ্রেড নোবেল কোটি কোটি ডলার লাভ করেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সেই অর্থ দিয়ে নোবেল পুরস্কার প্রচলন হয়। প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯০১ সালে। ব্যালিস্টাইট, কর্ডাইট তৈরি হওয়ার পর বিস্ফোরকগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে কাজে আসে। বারুদের জায়গা নেয় নতুন বিস্ফোরক। নতুন প্রপেলেন্ট পাউডার আগেকার ব্ল্যাক পাউডারের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। বড় বড় কামান থেকে শুরু করে ছোট ছোট আগ্নেয়াস্ত্র, সর্বত্র প্রপেলেন্ট পাউডারের ব্যবহার শুরু হয়। পৃথিবীর সর্বত্র অর্ডন্যান্স কারখানায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ওই পরিবর্তনের স্বাদ পায় সৈনিকেরা।

উনবিংশ শতকের শেষ থেকে যুদ্ধসংক্রান্ত রাসায়নিক শিল্প স্থাপিত হতে থাকে। রাসায়নিক যুদ্ধে বিভিন্ন

রাসায়নিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়। টিয়ার গ্যাস, নার্ভ গ্যাস, ভমিটিং গ্যাস, চোকিং গ্যাস, ব্লিস্টার গ্যাস প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল। একদিকে জার্মানরা, অন্যদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা পরস্পরের বিরুদ্ধে মারণ-রাসায়নিক নিয়ে লড়াই করেছিল। প্রত্যেকেই তাদের দেশের রাসায়নিক শিল্পগুলো এসব তৈরির কাজে লাগিয়েছিল। রাসায়নিক মারণাস্ত্র তৈরি করতে হামেশাই ক্লোরিন, ব্রোমিন, ফসজিন, ক্লোরো–অ্যাসিটো ফেনোন, ব্রোমোবেঞ্জাইল সায়ানাইড, ডাইফিনাইল ক্লোরো আর্সাইন, সালফার ডাইক্লোরাইড ইত্যাদি লাগে। সুতরাং এই সমস্ত পদার্থ তৈরি হতে পারে এমন রাসায়নিক শিল্প ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে যথেষ্ট সংখ্যায় তৈরি হয়। নাইট্রোগ্লিসারিন তৈরির জন্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ গ্লিসারিন প্রয়োজন হয়। উদ্ভিজ্জ তেল থেকে এটা পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ তেলকে ক্ষার দিয়ে বিক্রিয়া করালে গ্লিসারিন উৎপাদিত হয়। গ্লিসারিন তৈরির কারখানা ইউরোপের দেশে দেশে এই সময় স্থাপিত হয়। এই শিল্পের অন্যতম পার্শ্ব-উৎপাদক হলো সাবান। তাই সাবানশিল্পের তখন যথেষ্ট বিস্তার ঘটে।

চতুর্থ পর্যায়

মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে শক্তির ব্যবহার চিরকাল গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথম দিকে মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর পেশিশক্তি, পানি, বাতাস, রোদের শক্তি ব্যবহার হয়েছে। অষ্টাদশ শতক থেকে ক্রমে এসেছে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মাধ্যমে তাপশক্তির ব্যবহার। একশ বছর পর বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের সুযোগ এসেছে। বর্তমান যুগে বিদ্যুৎশক্তি, কয়লা এবং তরল পেট্রোলিয়াম জ্বালানির শক্তির ব্যবহার চলছে।

ঊনবিংশ শতকের শেষে বিদ্যুৎশক্তিকে শিল্পে লাগানোর অনেক আগে থেকে বিজ্ঞানীরা অবশ্য বিদ্যুতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকে লেডেন জারে বিদ্যুৎ সংরক্ষণ, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মেঘবিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা, কুলম্বের বিদ্যুৎ আধানের পরিমাপ, গ্যালভানির বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা ইত্যাদি শেষ করে বিজ্ঞানীরা ভোলটার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরীক্ষায় এসে পৌঁছালেন। তখন ঊনবিংশ শতকের শুরু। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হামফ্রি ডেভি এই সময় বিদ্যুতের সাহায্যে অনেক রাসায়নিক পরীক্ষা করেন, আবিষ্কৃত হয় নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ। তারপর ওহম, ফ্যারাডের যুগ পার হয়ে যখন ওই শতকের শেষে এসে পৌঁছাই তখন দেখি, বিদ্যুৎশক্তি তৈরি, ব্যবহার করতে বিজ্ঞানীরা অনেক বেশি দক্ষ হয়েছেন। ডায়নামো আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে তখন মানুষ সক্ষম। ১৮৭২ সালে জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ফন হেফনার-অল্টেনেক (Hafner-Alteneck) (পাশের চিত্র) জবরদস্ত ডায়নামো তৈরি করে ফেললেন। বিদ্যুতের ব্যবহার তত দিনে শিল্পজগতে এসেছে, এসেছে টেলিগ্রাফিতে সংবাদ আদান–প্রদানের ব্যবস্থা। ইলেকট্রিক মোটর তৈরি করলেন জোসেফ হেনরি। আলভা এডিসন বিদ্যুৎ তৈরি করে বিক্রি করতে লাগলেন। ব্যবসা জমে গেল। ইলেকট্রিকের আলো ও শক্তি বেচে কারবারিরা ফুলে–ফেঁপে উঠলেন। কয়লাকেন্দ্রিক তত্ত্ববিজ্ঞান, অর্থাৎ তাপগতিবিজ্ঞান এবং ইলেকট্রিসিটি–নির্ভর তত্ত্ববিজ্ঞান ইলেকট্রোডিনামিকস যথাক্রমে কয়লা ও ইলেকট্রিসিটি শিল্পের তাত্ত্বিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল। আমেরিকার নায়াগ্রা জলপ্রপাত থেকে অতি সস্তায় বিদ্যুৎ তৈরি করা গেল। বিদ্যুৎনির্ভর

শিল্পে তাই আমেরিকা প্রথম থেকে সুবিধা পেল। নরওয়ে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদনেও সক্ষম হয়েছিল। বিদ্যুৎ রাসায়নিক পরিবর্তনে ভূমিকা নেয়, এটা হামফ্রি ডেভির সময় থেকে জানা ছিল। তড়িৎ বিশ্লেষণ করে একদিকে যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন গ্যাস পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় কয়েকটা ধাতু, যেমন সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম। তাছাড়া হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ও ক্ষার তৈরি করা যায় তড়িৎ বিশ্লেষণ করে। তাম্রশোধন, স্বর্ণশোধন, সিসাশোধন, রুপাশোধন কাজে তড়িৎশক্তির প্রয়োজন হয়। সস্তার বিদ্যুৎ দিয়ে এসব তৈরি হওয়ার পর দেখা গেল যে উৎপাদিত বস্তু এবং তার থেকে তৈরি আরও শিল্পদ্রব্যের মূল্য বাজারে বেশ কমে গেছে।

বিদ্যুৎচালিত শিল্পের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন শিল্প। ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত লৌহশিল্প প্রাধান্য বজায় রেখেছে। এই সময় বাজারে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া গেলেও তার দাম ছিল অত্যধিক। এক পাউন্ড অ্যালুমিনিয়ামের দাম পড়ত একশ ডলার। সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডকে সোডিয়াম দিয়ে বিজারণ করে অ্যালুমিনিয়াম তৈরি হতো। ১৮৪৫ সাল থেকে পদ্ধতিটা চালু হয়েছিল, তবে কখনোই জনপ্রিয় হতে পারেনি। ১৮৮৬ সালে চার্লস হলো তড়িৎ বিশ্লেষণ করে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন শুরু করেন। অ্যালুমিনিয়ামের দাম পড়ে হলো পাউন্ডপ্রতি মাত্র আট ডলার। শোধন করা অ্যালুমিনিয়ামকে গলিত ক্রায়োলাইটে দ্রবীভূত করে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে তড়িৎদ্বারে অ্যালুমিনিয়াম জমা পড়ে। কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীজুড়ে অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন এত বাড়ল যে পাউন্ডপ্রতি অ্যালুমিনিয়ামের মূল্য হলো মাত্র দুই ডলার। বিংশ শতাব্দীতে বহু ব্যাপারে অ্যালুমিনিয়াম লোহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। শুধু হালকা নয়, অ্যালুমিনিয়াম বিদ্যুৎ পরিবাহীতে তামার থেকেও দ্বিগুণ দক্ষ। কয়েকটা ধাতুর সঙ্গে মিশে অ্যালুমিনিয়াম সংকর ধাতু তৈরি করে, এই সংকর ধাতুগুলো বিভিন্ন কাজের উপযোগী। অ্যালুমিনিয়ামের তড়িৎ নিষ্কাশনের অল্প পরে ম্যাগনেসিয়ামকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে নিষ্কাশিত করা হয়। গলিত ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয়। গলিত কার্নেলাইট নিয়েও কাজ হয়। বিমান তৈরিতে ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর বিশেষ উপযোগিতা আছে। বিংশ শতকে যত দিন যেতে থাকে তত বিমানের প্রয়োজন বাড়ে, তত ম্যাগনেসিয়াম উৎপাদিত হয়।

সোডিয়াম ধাতুও তড়িৎ বিশ্লেষণ করে সংগ্রহ করা হয়। জার্মানি ও আমেরিকা কাজটা করেছিল। সোডিয়াম ক্লোরাইডে অনার্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে তড়িৎদ্বারে সোডিয়াম জড়ো হয়। সাধারণত তীব্র তড়িৎ ধনাত্মক ও তীব্র তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলিক পদার্থকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়। বিরঞ্জক হিসেবে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের সুনাম আছে। রেশম, পশম, পালক, চুল প্রভৃতির রং দূর করার কাজে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ভূমিকা নিতে পারে। সালফিউরিক অ্যাসিডকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে এই অতি প্রয়োজনীয় যৌগটি তৈরি করা হয়। ক্লোরেট ও পারক্লোরেট লবণও তড়িৎ বিশ্লেষণ করে বানানো যায়।

সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আর এক ধরনের কাজে সাফল্য আসে। চুল্লির উষ্ণতা বাড়ানের জন্য বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার হয়। কয়লা পুড়িয়ে ১৬০০° বা ১৭০০° সেন্টিগ্রেডের বেশি উত্তাপ চুল্লিতে সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে তাকে সহজেই ৪০০০° সেন্টিগ্রেড করা যায়। অতি উচ্চ উষ্ণতায় অনেক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্ভব, অনেক নতুন নতুন পদার্থকে বিদ্যুৎ-চুল্লিতে সৃষ্টি করা যায়। ঊনবিংশ

শতকের শেষ থেকেই বিদ্যুৎ-চুল্লি কারখানাতে দেখা যেতে থাকে। ফলে ক্যালসিয়াম কার্বাইড, কার্বন ডাইসালফাইড, সিলিকন কার্বাইড, সিলিকন, ফসফরাস, গ্রাফাইট, ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড প্রভৃতি তৈরি হতে থাকে।

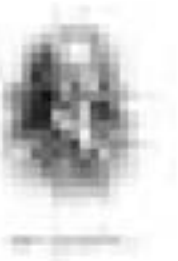

১৮৯১ সালের আগে যাবতীয় ঘর্ষণক্ষম পদার্থ (abrasive) যেমন হিরা, কুরুবিন্দ, এমেরি প্রাকৃতিক পদার্থ ছিল। সে বছরই ই. জি. অ্যাকসন (E.G. Acheson) (পাশের চিত্র) প্রথম কৃত্রিম ঘর্ষণক্ষম পদার্থ তৈরি করেন। তিনি বিদ্যুৎ-চুল্লিতে সিলিকন কার্বাইড তৈরি করেন। কার্বোরান্ডাম নামে তিনি এই পদার্থটি বাজারে বিক্রি করতে থাকেন, পদার্থটি বাজারে ভালোই বিকোত। এটার কাচ কাটার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল। ক্রমে ফিউজড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, বোরন কার্বাইড তৈরি হল। এগুলোও বিদ্যুৎ-চুল্লিতে উৎপাদিত হয়েছিল।

ক্যালসিয়াম কার্বাইড পদার্থটি অ্যাসিটিলিন উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ক্যালসিয়াম কার্বাইডে পানি দিলে তা অ্যাসিটিলিন উৎপন্ন করে, পড়ে থাকে চুন। আলো জ্বালানের জন্য অ্যাসিটিলিন বা 'কার্বাইড গ্যাস' খুব ব্যবহার হয়। আকস্মিকভাবে ১৮৯২ সালে টমাস উইলসন (Willson) (পাশের চিত্র) ক্যালসিয়াম কার্বাইড তৈরি করে ফেলেছিলেন। পোড়া চুন ও কার্বনকে ২০০০° সেন্টিগ্রেডে বিদ্যুৎ-চুল্লিতে উত্তপ্ত করলে ক্যালসিয়াম কার্বাইড পাওয়া যায়। সস্তায় বিদ্যুৎ পেতে নায়াগ্রা জলপ্রপাতে অদূরে প্রথম ক্যালসিয়াম কার্বাইডের কারখানা স্থাপিত হয়। অনুরূপভাবে কার্বন ও গন্ধককে ১০০০° সেন্টিগ্রেডে বিদ্যুৎ-চুল্লিতে উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাই–সালফাইড তৈরি হয়।

যত দিন গেছে, বিদ্যুৎ-চুল্লির দিকে শিল্প বেশি ঝুঁকেছে। উষ্ণতাকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, দূষণ নেই, সহজেই চার-পাঁচ হাজার ডিগ্রির তাপমাত্রা অর্জন করা যায়, এতটা সুযোগ কয়লা বা গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম পুড়িয়ে তৈরি করা যায় না। ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিদ্যুৎ ব্যাপকহারে শিল্পে ব্যবহার হচ্ছে। কোনো দেশের উৎপন্ন বিদ্যুতের বেশির ভাগটা শিল্প ব্যবহার করে। কারখানা আলোকিত করতে বা ঘর ঠান্ডা করতে যতটা বিদ্যুৎ লাগে, তার থেকে বেশি লাগে নানান যন্ত্র চালাতে ও বিদ্যুৎ-চুল্লিতে। আগামী দিনে এই ধরনের কাজে কয়লা পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার একেবারে শেষ হয়ে যাবে, সবটাই বিদ্যুতের সাহায্যে চলবে।

পঞ্চম পর্যায়

বিংশ শতাব্দী উপস্থিত হলো। ইতিমধ্যে চারটি বড় বড় পর্যায়ে রাসায়নিক শিল্প নতুন করে গতি পেয়েছে। এক একটা পর্যায়ে নতুন চাহিদা তৈরি হয়েছে, ফলে নতুন ধরনের রাসায়নিক শিল্প স্থাপিত হয়েছে। তখন গতানুগতিকতা থেকে এই শিল্প মুক্ত হয়ে হঠাৎ প্রাণ পেয়েছে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পলিমার প্লাস্টিক শিল্প একটা নতুন গতি সঞ্চার করে। এটাই পঞ্চম পর্যায়। একই সময়ে কৃত্রিম তন্তুকে কেন্দ্র করে এক বিশাল রাসায়নিক শিল্প গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক কার্পাস, পশম, রেশম, কাঠ, রাবার, কাগজ সবই পলিমার, অর্থাৎ ছোট ছোট রাসায়নিক ইউনিটের পুনরাবৃত্তি। এসব জিনিস কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করার চেষ্টা চলেছে অনেক দিন। বিংশ শতকের শুরুতে তা শিল্প-পর্যায়ে উন্নীত হয়।

স্কনবিয়েন-এর নাইট্রোসেলুলোজ আবিষ্কারের পর (১৮৪৫ খ্রি.) তা শুধু বিস্ফোরক হিসেবে পরিচিত হয়নি, আংশিকভাবে নাইট্রেটেড এমন নাইট্রোসেলুলোজ দিয়ে এক ধরনের কৃত্রিম রেশম তৈরি হয়। এর পেটেন্ট দেওয়া হয়েছিল। ১৮৯০ সালে কিউপ্রামোনিয়াম রেয়ন-এর পেটেন্ট গৃহীত হয়। ভিসকাস রেয়ন, নাইট্রোসেলুলোজ রেয়ন, সেলুলোজ অ্যাসিটেট ইত্যাদির শিল্পোৎপাদন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে শুরু হয়ে যায়। ক্রমে নতুন নতুন কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কৃত হয়, শিল্পে তাদের উৎপাদন হয়। নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রন নামের তন্তু বাজারে ছেয়ে যায়। বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক তন্তু খুব কমই মানুষ ব্যবহার করে। রাসায়নিক শিল্পের একটা বড় দিক কৃত্রিম তন্তুর কারখানাগুলো খুলে দেয়। প্রায় একই সঙ্গে আরও পলিমার তৈরি হতে থাকে। প্লাস্টিক যুগ শুরু হয়। প্রাকৃতিক রাবারের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়, কৃত্রিম রাবার বাজার ছেয়ে ফেলে।

প্লাস্টিক সম্পর্কে গবেষণা মধ্য-উনবিংশ শতকে শুরু হলেও তা শিল্প স্তরে আসতে সময় লেগেছিল। লিও বেকল্যান্ড (Leo Backeland) (পাশের চিত্র) প্রথম বাণিজ্যিক ফেনলিক রেজিন তৈরি করেন। সেটি ১৯০৯ সাল। তাঁর নামানুসারে জিনিসটার নাম হয় 'বেকেলাইট'। ফেনল ও ফরম্যালডিহাইড জুড়ে জুড়ে বেকেলাইট তৈরি হয়। এটাই প্রথম ফেনলিক রেজিন। বিশের দশকের পর আরও বেশ কিছু ফেনলিক রেজিন বানানো হয়েছিল। ক্রমে অ্যাক্রাইলিক রেজিন, পলিভিনাইল রেজিন, পলিস্টাইরিন, পলিইথিলিন একে একে বাজারে এলো।

প্রাকৃতিক রাবারের সঙ্গে ইউরোপবাসীর প্রথম পরিচিত হয় দক্ষিণ আমেরিকায় আসার পর। ও দেশের এক ধরনের গাছের কষ (latex) জমিয়ে রাবার উৎপন্ন হতো। প্রিস্টলি দেখেন যে জিনিসটা কাগজে টানা পেনসিলের দাগ ঘষে তুলতে পারে। তিনি এটার নাম দিলেন 'রাবার'। চার্লস গুডইয়ার রাবারের মধ্যে গন্ধক মিশিয়ে চাপ-তাপ প্রয়োগ করে তাকে আরও কার্যকরী করেন। শুরু হয় নানান কাজে প্রাকৃতিক রাবারের ব্যবহার। নানা রাবার কোম্পানি চারদিকে গড়ে ওঠে। রাবার নিজে একটি পলিমার। আইসোপ্রিন নামের একটি ক্ষুদ্র হাইড্রোকার্বন অণুর পারস্পরিক যোগে গড়ে উঠেছে রাবারের বৃহৎ অণু। এটা লক্ষ করে কৃত্রিম রাবার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ১৮৬০ থেকে প্রাকৃতিক রাবারের প্রতিস্থাপনের চেষ্টা চলতে থাকে। জার্মানরা 'মিথাইল রাবার' বানিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নিওপ্রিন, বুটাইল রাবার, নাইট্রাইল রাবার তৈরি করা সম্ভব হয়। বুটাডাইনের সঙ্গে স্টাইরিন বা আইসোপ্রিন বা অ্যাক্রাইলোনাইট্রাইল জুড়ে জুড়ে বিবিধ কৃত্রিম রাবার তৈরি হয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা আগেও কৃত্রিম জিনিস বানিয়েছেন। রঙের আদর্শ উদাহরণ রং যতটা ব্যবহারিক জগতে প্রয়োগযোগ্য তার থেকে আরও বেশি প্রয়োগ হয় কৃত্রিম পলিমারগুলো। প্রাকৃতিক সামগ্রীর সঙ্গে মিশে কৃত্রিম সামগ্রীগুলো আরও উন্নত গুণযুক্ত জিনিস তৈরি করে। প্রাকৃতিক কাঠ, কাগজ, সুতো, রেশমের সঙ্গে মিলে মিশে কৃত্রিম পদার্থগুলো আরও উন্নত হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে প্রথমে জার্মানি, পরে আমেরিকা সব থেকে এগিয়ে যায়।

ইথিলিন গ্যাসকে অনুঘটক ব্যবহার করেও চাপ, তাপের মধ্যে ফেলঙ্গে ইথিলিনির অসংখ্য অণুর পরস্পরের

সঙ্গে জুড়ে তৈরি হয় পলিইথিলিন। আমেরিকানরা এটাকে 'পলিইথিলিন' বললেও ইংরেজরা বলে 'পলিথিন'। জিনিসটা হালকা, জলের ওপর ভাসে, বিদ্যুৎ অপরিবাহী, জলনিরোধক। এসব গুণের জন্য পলিথিনের চাহিদা হয়। পলিথিন তৈরির কারখানা বিংশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে আমেরিকায় বেশি সংখ্যায় তৈরি হতে থাকে। পলিথিনের মধ্যে শাখা-শাখা এক রৈখিক রাসায়নিক বন্ধনী থাকায় তা খুব অল্প উষ্ণতায় গলে যায়। এটা আবার অসুবিধাজনক। পলিথিন তৈরির সময় উচ্চচাপের প্রয়োজন হয়। উচ্চচাপে প্রস্তুত এমন পদার্থ সাধারণ চাপে এসে বাঁধুনিগত দুর্বলতা প্রকাশ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান কেমিস্ট কার্ল

জিগলার (Karl Ziegler) (পাশের চিত্র) কম চাপে পলিথিন উৎপন্ন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাতে সরল বন্ধনীর আবির্ভাব হয়। শক্ত ধরনের এই পলিথিন তখন নানা কাজে লাগে। ইথিলিনের চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে ফ্লুরিন পরমাণু দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে পাওয়া যায় টেট্রাফ্লুরোইথিলিন। এই টেট্রাফ্লুরোইথিলিনকে পরস্পরকে সঙ্গে জুড়লে পলি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন হয়, এটাই বিখ্যাত 'টেফলন'। প্রায় সব রাসায়নিক কাজে নিজেকে দুর্ভেদ্য করে টেফলন খ্যাতি অর্জন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে টেফলনকে শিল্পে উৎপাদন করা হতে থাকে।

ভিনাইল যৌগাংশবাহিত জৈব যৌগ সংযুক্ত করে পলিভিনাইল রেজিনগুলো উৎপাদিত হয়, যেমন পলিভিনাইল অ্যাসিটেট, পলিভিনাইল ক্লোরাইড ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্পোন্নত দেশে বহু প্লাস্টিক উৎপাদিত হতে থাকে। তাদের বিবিধ গুণ বর্তমান। এই সব জিনিস উৎপাদিত হতে হতে রাসায়নিক শিল্পের একটা নতুন পর্যায় আসে। এটি হলো পেট্রোকেমিক্যালস পর্যায়। খনিজ তেলের উপাদান ব্যবহার করে পেট্রোকেমিক্যালস শিল্প গড়ে ওঠে।

ষষ্ঠ পর্যায়

খাদ্য ও বস্ত্রশিল্পের পরেই আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হলো পেট্রোকেমিক্যালস শিল্প। আধুনিক কালে এই শিল্প মানুষের ব্যবহার্য বহু জিনিস সরবরাহ করে। পলিমার প্লাস্টিক শিল্প ও পেট্রোকেমিক্যালস শিল্প একসঙ্গে বর্তমান জীবনে প্রয়োজনীয় সব কঠিন পদার্থের উৎপাদনের একটা বড় অংশ দখল করেছে, দখলদারির সীমানা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। বনাঞ্চল কমে যাওয়া ও সংরক্ষণের কারণে কাঠের ব্যবহার কমছে, ধাতব আকরিকের অপ্রতুলতা ধাতুর ব্যবহার কমিয়েছে। তাছাড়া এগুলো আর্থিক বিচারে সুলভ নয়। কাঠ, ধাতুর জায়গা নিচ্ছে নানা ধরনের পলিমার, প্লাস্টিক, রাবার, পেট্রোকেমিক্যালস থেকে জাত পদার্থ। একসময় কয়লা নানান জৈব রাসায়নিক পদার্থ জোগান দিত। কিন্তু কয়লার গুরুত্ব নানা কারণে কমে যায়। আজ তার জায়গা নিয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম। কৃষিজ সামগ্রীও (ভুট্টা, আখ) ক্রমে এই শিল্পের কাঁচামাল হচ্ছে। কৃষির রূপান্তর হচ্ছে রাসায়নিক শিল্পের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে।

পেট্রোকেমিক্যালস শিল্পের বিকাশের আর একটি কারণ হলো- খনিজ তেল থেকে জাত রাসায়নিকগুলো তুলনায় সস্তা। পেট্রোল, ডিজেল, এভিয়েশন ফুয়েল, এলপিজি, সিএনজি প্রভৃতি জ্বালানি খনিজ তেল থেকেই পাওয়া যায়।

ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, এত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ তেলের আবিষ্কার ও ব্যবহারের ইতিহাস মাত্র শ'খানেক বছরের কিছু বেশি। আমেরিকায় আদিবাসীরা মাটি থেকে চুঁইয়ে আসা খনিজ তেল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করত। তাই দেখে কর্নেল ড্রেক প্রথম তেলের কূপ খনন করেন। সেটা উনবিংশ শতকের শেষের দিকের কথা। খনিজ তেল থেকে প্রথমে কেরোসিন তৈরি হয়। জ্বালানি ও আলো প্রদানকারী তরল হিসেবে কেরোসিন খুব জনপ্রিয় হয়। খনিজ তেলকে অংশ-পাতন করে নানান জৈব পদার্থ পাওয়া যায়। তাছাড়া অনুঘটকের সাহায্য নিয়ে তুলনামূলকভাবে বড় বড় অণুসমৃদ্ধ রাসায়নিককে ভেঙে ছোট ছোট অণুতে তৈরি করা হয়, যাকে ক্রাকিং (craoking) বলে। এই ছোট ছোট অণু দিয়ে পরবর্তী স্তরে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদন করা হয়।

গত শতকের পঞ্চাশের দশকে বিজ্ঞানীরা পেট্রোলিয়ামে কী কী আছে, তা বের করেন। তারপর থেকেই পেট্রোকেমিক্যালস শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। পেট্রোলিয়ামে থাকা বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোকার্বন, যেমন নরমাল প্যারাফিন, আইসো প্যারাফিন, ওলিফিন, বেঞ্জিন বলয় ও ন্যাপথালিন বলয়সম্ভাত পদার্থ। ওলিফিনগুলো যত না পেট্রোলিয়ামে থাকে, তার থেকে বেশি উৎপাদিত হয় ক্রাকিংয়ের মাধ্যমে। অংশপাতন করে খনিজ তেল থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, সলভেন্ট ন্যাপথা, লাইট হিটিং অয়েল, মোম, অ্যাসফাল্ট ইত্যাদি তৈরি হয়। পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপন্ন রাসায়নিক, অর্থাৎ পেট্রোকেমিক্যালসের মধ্যে প্রথমে নাম করতে হয় অ্যামোনিয়া, কার্বন ব্যাক, বুটাডাইন, স্টাইরিনের। এছাড়া হাজার রকমের জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি হয়। মোট রাসায়নিক শিল্পজাত পদার্থের প্রায় পঁচিশ শতাংশ এবং মোট জৈব রাসায়নিক শিল্পজাত পদার্থের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ হলো পেট্রোকেমিক্যালস। বর্তমানে গোটা রাসায়নিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ আসে পেট্রোকেমিক্যালস থেকে। বিশ্বের উৎপাদিত খনিজ তেলের মাত্র ৫ শতাংশ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মাত্র ৩ শতাংশ থেকে যাবতীয় পেট্রোকেমিক্যালস উৎপাদিত হয়। বাকিটা বিভিন্নভাবে জ্বালানির কাজে লাগে।

একটি পেট্রোকেমিক্যালস শিল্পকারখানা

এত পেট্রোকেমিক্যালসের মধ্যে প্রথম তৈরি হয়েছিল কার্বন ব্ল্যাক। এটা কালো রং তৈরির কাজে লাগে। ১৮৭২ সালে সর্বপ্রথম কার্বন ব্ল্যাক তৈরি হয় প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। প্রাকৃতিক গ্যাসকে বাতাসে

আংশিকভাবে দহন করলে কার্বন ব্ল্যাক উৎপন্ন হয়। এরপর অনেক দিন পেট্রোলিয়াম শিল্পে বিশেষ কাজ হয়নি। জ্বালানি ও আলোর উৎসরূপে যা কিছু ব্যবহারে তা আটকে ছিল। ১৯১৩ সালে প্রথম ক্রাকিং আবিষ্কৃত হয়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বছরগুলোতে পেট্রোলিয়াম ভেঙে নানা উপাদান তৈরি হয়। বিশেষ করে ১৯২০ সালে আমেরিকায় স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি স্থাপিত হওয়ার পর পেট্রোকেমিক্যালস শিল্প বিশেষ অগ্রগতি লাভ করে। ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানি ১৯২৩ সালে প্রথম ইথিলিনের পেট্রোকেমিক্যাল ব্যবহার করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে ক্রমে পেট্রোকেমিক্যালস দিয়ে এমন সব পদার্থ তৈরি হতে থাকে, যা প্রাকৃতিক সামগ্রীকে প্রতিস্থাপিত করে। আজ অনেক পদার্থই এই শিল্পের দান। অর্থাৎ পেট্রোকেমিক্যালস ব্যবহার করে যেসব রেজিন (পলিমার) তৈরি হয়, তার সাহায্যে ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী, যেমন কৃত্রিম অঙ্গ, নানা রকমের ব্যাগ, বেলুন, মোমবাতি, কৃত্রিম তন্তু দিয়ে উৎপন্ন জামাকাপড়, চিরুনি, কম্পিউটার ও ক্যালকুলেটারের যন্ত্রাংশ, ক্রেডিট কার্ড, বাসন ধোয়ার তরল সাবান, চশমা, সার, মেঝের আবরণ, পেস্ট জেলি, ক্রিম, হেলমেট, মশা প্রতিরোধক, জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট, পেন্ট ব্রাশ, প্যারাশুট, কলম, সুগন্ধি, দড়ি (নাইলন), নিরাপত্তামূলক কাচ, কনট্যাক্ট লেন্স, নরম পানীয়ের বোতল, ক্যাসেটের টেপ, টেলিফোন, পরবার জ্যাকেট, টেনিস র‍্যাকেট, তাঁবু, খেলনা, টায়ার, টিভির খোল, ছাতা, বাসন, জলনিরোধক জ্যাকেট ইত্যাদি তৈরি হয়।

পেট্রোলিয়াম থেকে ক্রাকিং করে ইথিলিন, প্রপিলিন, বেঞ্জিন, টলুইন, তিন ধরনের জাইলিন ও আরও অনেক হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়। ইথিলিন থেকে তৈরি হয় পলিইথিলিন, ইথানল, ইথিলিন অক্সাইড, ১-২ ডাইক্লোরোইথেন প্রভৃতি। শেষটি থেকে প্রথমে ভিনাইল ক্লোরাইড তৈরি করে তারপর পলিভিনাইল ক্লোরাইড বা পিভিসি তৈরি করা হয়। পিভিসি একটা বিখ্যাত পলিমার। এর বহু ব্যবহার আছে। তারপর ইথিলিন অক্সাইড থেকে ইথিলিন গ্লাইকল তৈরি করে, তার থেকে পলিয়েস্টার ও ইঞ্জিন কুল্যান্ট উৎপন্ন করা হয়। পলিয়েস্টার দিয়ে জামা কাপড় হয়, আর কুল্যান্ট দিয়ে অটোমোবাইলের ইঞ্জিন ঠান্ডা করা হয়।

প্রপিলিন থেকে আইসোপ্রপাইল অ্যালকোহল, অ্যাক্রাইলোনাইট্রাইল, পলিপ্রপিলিন, প্রপিলিন অক্সাইড, অ্যালাইল ক্লোরাইড প্রভৃতি তৈরি হয়। অ্যালাইড ক্লোরাইড থেকে শেষ পর্যন্ত বানানো হয় বিখ্যাত ইপক্সি (epoxy) রেজিন। বেঞ্জিন থেকে প্রথমে ইথাইল বেঞ্জিন, তারপর স্টাইরিন, তারপর পলিস্টাইরিন বানানো হয়। এছাড়া বেঞ্জিন থেকে সাইক্লোহেক্সেন, তারপর নাইলন তৈরি হয়। বেঞ্জিন থেকে অ্যালকিল বেঞ্জিন, শেষে বিভিন্ন ডিটারজেন্ট উৎপন্ন হয়। তাছাড়া টলুইন থেকে পলিইউরেথেন, নাইলন বানানো যায়। বিভিন্ন জাইলিন থেকে পলিএস্টার অ্যালকিল রেজিন ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। প্যারা জাইলিন থেকে ডাইমিথাইল টেরেথ্যালেট ও টেরেথ্যাথিক অ্যাসিড প্রথমে তৈরি করে তারপর তা থেকে পলিয়েস্টার উৎপন্ন হয়। কৃত্রিম তন্তু শিল্পে পলিয়েস্টারের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। অর্থো জাইলিন থেকে আবার থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড তৈরি করা যায়। এটাও গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক, যা ব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদনে লাগে।

বর্তমান যুগে পেট্রোকেমিক্যালস শিল্প ও রসায়নশিল্প প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। যেহেতু রসায়নশিল্পের বেশির ভাগ কাঁচামালের উৎস পেট্রোকেমিক্যালস, তাই বলা যায় পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পকে অবহেলা করে এখন আর কোনো দেশ রাসায়নিক শিল্প গড়তে পারবে না। ইউরোপ, আমেরিকার সব উন্নত দেশ পেট্রোকেমিক্যালস শিল্পে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। এমনকি খনিজ তেলের উৎপাদনকারী দেশগুলোও এই শিল্প

গড়ছে। রসায়নশিল্প গড়ার প্রথম দিকে অজৈব রাসায়নিকের গুরুত্ব ছিল। তারপর বেশির ভাগ উৎপাদিত রাসায়নিক ছিল জৈব প্রকৃতির। আজ অজৈব রাসায়নিক যতটুকু ছিল তা আছে, কিন্তু গোটা জৈব রাসায়নিক শিল্পটা রূপ পেয়েছে পেট্রোকেমিক্যালস শিল্পে। এই শিল্পে কয়লা প্রায় পরিত্যক্ত। কয়লার জ্বালানি হিসেবে গুরুত্ব থাকলেও রাসায়নিক শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে কয়লা পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারছে না। তার জায়গায় কৃষিজ সামগ্রী ক্রমশ উঠে আসছে। আগামী দিনে কতগুলো নির্দিষ্ট ফসল থেকে পলিমারগুলোর প্রাথমিক অণু (মনোমার) পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। খনিজ তেলের সরবরাহ কমে গেলে বা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে এই কৃষিজ সামগ্রী তখন পেট্রোকেমিক্যালসের মনোমার সরবরাহ করবে।

উপসংহার

গত দু'শ বছরে রসায়নশিল্প ছয়টি মূল পর্যায়ে গড়ে উঠেছে। এই পর্যায়গুলোতে রসায়নশিল্প এমন এমন নতুন বাঁক মোড় নিয়েছে যে পরবর্তী বছরগুলোতে এই শিল্প অনেক নতুন পদার্থ নতুনভাবে তৈরি করতে পেরেছে। অর্থাৎ মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে বড় বড় উল্লম্ফন হয়েছে, মানুষ বেশি ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করতে পেরেছে। রসায়নশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বেড়েছে এবং নতুন নতুন পণ্য তৈরি হয়েছে। আধুনিক রসায়নশিল্পের গোড়াপত্তনের সময় একজন ইউরোপবাসী বা আমেরিকান ৩০০টি জিনিসপত্র কিনত, আর বর্তমানে সে কিনছে প্রায় ১০ লাখ রকমের জিনিস। রসায়নশিল্পের এমন উন্নতির পেছনে আছে রসায়নের তাত্ত্বিক জ্ঞানের উন্নয়ন। গত দু'শ বছরে ক্রমান্বয়ে রসায়নের নতুন নতুন শাখা জন্ম নিয়েছে। প্রথমে অজৈব রসায়ন, তারপর জৈব রসায়ন, তারপর ভৌত রসায়ন ও প্রাণরসায়ন, তারপর নিউক্লিয় রসায়ন, তারপর পরিবেশ রসায়ন। তাত্ত্বিক রসায়নের একটা বড় অংশ রসায়নশিল্পকে সাহায্য করেছে। বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং অন্যান্য শাখাও রসায়নশিল্পকে সাহায্য করেছে। আগামী দিনে ন্যানো প্রযুক্তি রসায়নশিল্পের আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। আরও উন্নত, আরও সহজলভ্য, আরও পরিবেশবান্ধব রসায়নশিল্প আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রবন্ধকার : জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক ও গ্রন্থকার, সাধারণ সম্পাদক, প্রান্তিক বিজ্ঞানাগার কেন্দ্রীয় শাখা, খুলনা।

মাস্ক-গ্লাভসের বর্জ্য: চাই বিজ্ঞানসম্মত সমাধান

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

প্রকৃতির সুশোভিত ও পল্লবিত রূপ ফিরে এসেছে করোনা মহামারির পথ বেয়ে। একদিকে মানুষ বিপর্যস্ত, অন্যদিকে প্রকৃতি উদ্ভাসিত। এ পৃথিবী এখন পাখপাখালির পৃথিবী, পোকামাকড়ের পৃথিবী, সবুজ বৃক্ষলতার পৃথিবী। আর মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিই অসহায় মানুষের নিত্যসঙ্গী। করোনাভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচতে এখন প্রয়োজন মাস্ক-গ্লাভস-স্যানিটাইজার। বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মাস্ক-গ্লাভস-পিপিইর উৎপাদন চলছে। স্যানিটাইজারও উৎপাদিত হচ্ছে টনে টনে। কিন্তু ব্যবহারের পর এসব বর্জ্যের গন্তব্য কোথায়?

নিঃসন্দেহে পরিবেশঝুঁকির এ এক নতুন মাত্রা। এ মুহূর্তে প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক গবেষণাভিত্তিক দিকনির্দেশনা। এসব পুরোপুরি জৈব বর্জ্য নয়, যা পরিশোধন করে রূপান্তরযোগ্য। ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং বিনষ্টের লক্ষ্যে আমাদের সুনির্দিষ্ট আইন আছে। 'বাংলাদেশ মেডিকেল বর্জ্য বিধিমালা-২০০৮'- এ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা আছে।

প্রথমে বর্জ্য চিহ্নিত, তারপর বর্জ্যের শ্রেণিবিন্যাস এবং সবশেষে কোন প্রক্রিয়ায় বর্জ্য ডিসপোজাল, অর্থাৎ ধ্বংস, পোড়ানো বা পুঁতে ফেলা হবে, তা নিশ্চিতকল্পে প্রতিটি জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে। এ কমিটিতে সিভিল সার্জনসহ বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসনের প্রতিনিধি রয়েছেন। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট অভিযানের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমরা কত উদাসীন ও দায়িত্বহীন!

একসময় রাজধানীর টন টন বর্জ্য পলিথিনের গন্তব্য ছিল বুড়িগঙ্গা। ড্রেজিং করে বুড়িগঙ্গার তলদেশ থেকে ২০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭-৮ ফুট স্তর পলিথিনের বর্জ্য উত্তোলন করে নদী দূষণমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এর অর্থনৈতিক মূল্য বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু নদী তার হৃত প্রবাহ ফিরে পায়নি।

করোনা মহামারি শিক্ষা দিয়েছে, মানুষের অর্থ লোলুপতা ও সীমাহীন ভোগবাদিতার করুণ পরিণতি কী হতে পারে! প্রকৃতিকে নিঃস্ব, রিক্ত ও বিপর্যস্ত করে আজ স্বয়ং মানুষই ক্লান্ত, নিঃস্ব ও অশ্রুসিক্ত। কী মর্মান্তিক বাস্তবতা! করোনা প্রমাণ করেছে, মানুষ এ বিশাল প্রকৃতির মালিক নয়, প্রকৃতির একটি অংশমাত্র।

বাংলাদেশে আমরা পেয়েছি সবুজ প্রান্তর, নদ-নদী, পাহাড়-টিলা ও হাওর-বাঁওড়। পৃথিবীজুড়ে জীবন-জীবিকার জোগান নদীকেন্দ্রিক। বাংলাদেশের শিরা-উপশিরা নদীর পানি দিয়ে। অথচ নদীমাতৃক বলে আমাদের যে অহংকার ছিল, তা এখন অতীত স্মৃতি। ষাটের দশকের সাড়ে ৭০০ নদী কমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২৩০টিতে। দূষণে দূষণে বিষাক্ত এবং দখলে দখলে ক্ষতবিক্ষত করেছি নদীগুলোকে। হৃৎপিণ্ডের মতোই নদীগুলোর রক্তনালিতে সৃষ্টি করেছি অসংখ্য ব্লক।

সম্প্রতি সরকারের নদী উদ্ধার অভিযান বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। হাইকোর্ট ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে নদীকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে ঘোষণা দেন, অর্থাৎ যেকোনো ক্ষতি থেকে রক্ষায় নদীর আইনগত অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এখন করোনাসৃষ্ট কোটি কোটি মাস্কের বর্জ্য নতুন এক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এক গবেষণায় জানা গেছে, গত ২৬ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত শুধু ১ মাসে ১ হাজার ৫৯২ টন সার্জিক্যাল মাস্কের বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছে।

এমনিতে কোভিড-১৯ সারা বিশ্বে খাদ্যনিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। অর্থনৈতিক ক্ষতি, মানসিক চাপ ও মৃত্যুর মিছিলে আতঙ্কিত বিশ্ববাসী। এর মধ্যে মাস্ক-গ্লাভসের বর্জ্য পরিবেশ-সংকটকে ঘনীভূত করছে। কোটি কোটি মানুষের ব্যবহার করা মাস্কগুলো বর্জ্য হিসেবে অবক্ষেপণ করা হবে কীভাবে? তবে কি ডাস্টবিন, নালা-নর্দমা পেরিয়ে অবশেষে সঞ্চিত হবে নদীগর্ভে? এ দেশে নদ-নদীই আমাদের সবচেয়ে নিরাপদ বর্জ্যাগার! বর্জ্য মাস্ক নিয়ে কী সমস্যা হতে পারে, মাস্কের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেমন হবে, তার তথ্য-উপাত্ত নিয়ে এর সমাধান আমাদের বের করতে হবে। বর্জ্য লুকিয়ে রাখা যায় না, দূষণ কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা মানে না। এর প্রভাব ও অভিঘাত পরিবেশে পড়বেই। নাগরিকেরা যত্রতত্র বর্জ্য ফেলবে এবং ব্ল্যাকহোলের মতো সেগুলো নদীতে হারিয়ে যাবে, এটিই বাংলাদেশের পরিবেশগত বাস্তবতা। এ মুহূর্তে মাস্কের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, নগরী-মহানগরীর অলিগলি, ভবনের কোনা, নালা-নর্দমা মাস্কের বর্জ্যে একাকার হয়ে আছে। যেখানে রাজধানীর অধিকাংশ ড্রেন পলিথিন ব্যাগে জমাট বেঁধে থাকে, সেখানে বর্জ্য মাস্ক-গ্লাভস যোগ হয়ে কী বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তা অকল্পনীয়।

যে ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আমরা সুরক্ষিত মাস্ক, গ্লাভস ও পিপিই ব্যবহার করছি, সেসব উপাদানের কঠিন বর্জ্য যদি নদী, মাটি বা পানিদূষণের কারণ হয়, তবে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের! তথ্যানুসন্ধানে জেনেছি, ইংল্যান্ডে ব্যবহৃত মাস্ক পৃথক হলুদ বর্ণের চিহ্নিত ডাস্টবিনে ভরে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তবে স্যানিটাইজারে ব্যবহৃত কেমিক্যাল মূলত উদ্বায়ী বিধায় এর দূষণের প্রভাব খুব নগণ্য। প্রতিটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার, পুনর্চক্রায়ন এবং বিকল্প ব্যবহার পরিবেশ সুশাসনের অংশ।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রধানত অনুশাসন তিনটি: বর্জ্য সংগ্রহ, বর্জ্য পৃথক্করণ এবং বর্জ্য নিষ্পত্তিকরণ। হাসপাতালে ব্যবহৃত সংক্রামক বর্জ্য হাসপাতালের নিজস্ব বর্জ্যাগারে রেখে বিনষ্ট করা উচিত। হাসপাতালের বাইরে নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। যেহেতু মানুষের ব্যবহৃত মাস্ক-গ্লাভস প্রকৃতই বিপজ্জনক, তাই

বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে পুড়িয়ে ফেলার বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে সাধারণ বর্জ্য থেকে এ বর্জ্যকে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় পৃথক্করণ করতে হবেই। এমনকি ডাস্টবিনে বা ডাম্পিং স্টেশনে বেশি দিন রাখাও অনিরাপদ। এসব বর্জ্য টোকাইরা কুড়িয়ে নিলে আরও ভয়ংকর বিপদ। লোকালয় থেকে অনেক দূরে এগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

এসব কাজ ঠিকভাবে হয় কি না, তার কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। এ দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের একার নয়। প্রতিদিন নিক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত বর্জ্যের সঠিক পরিসংখ্যান রাখতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবশ্যই চিকিৎসক ও নার্সদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সিটি করপোরেশন/পৌরসভাগুলো বর্জ্য মাস্ক-পিপিই রাখার জন্য পৃথক স্থান নির্ধারণ করবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় এনে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিএসআরের অর্থ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সদ্ব্যবহার করা উচিত। তবেই আক্ষরিক ও নৈতিক বিবেচনায় সিএসআরে অর্থ ব্যয় সার্থক হবে।

বাংলাদেশে মাস্ক-গ্লাভস ব্যবসায় জড়িত উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করব, এসব পণ্য উৎপাদনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করুন। পণ্যের ভোক্তাদের বোঝার উপায় নেই কোনটি পরিবেশবান্ধব এবং কোনটি পরিবেশ-ঘাতক। কারণ, মুনাফার উন্মাদনায় পৃথিবী এখন করপোরেট সাম্রাজ্যের শিকলে বন্দী। উৎপাদনের লক্ষ্যই এখন ব্যবসায়িক, করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক-মানবিক হয়ে উঠতে পারেনি। এ যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা এবং পরিবেশ রক্ষা একসূত্রে গাঁথা। যে প্রকৃতি থেকে আহরণ করি আমরা এত সম্পদ, রস ও রসদ, সে প্রকৃতির প্রতি আমাদের কত নিষ্ঠুরতা ও আক্রোশ! পরিবেশের সবচেয়ে বড় শত্রু মানুষ। হাজার হাজার টেক্সটাইল ও ডাইংয়ের বিষাক্ত বর্জ্যে আমাদের নদীগুলোর অক্সিজেনের মাত্রা শূন্যে নেমে যায়।

সাম্প্রতিক সাধারণ ছুটিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান বন্ধ ছিল। অথচ লকডাউনে শিল্পবর্জ্য নির্গমন হ্রাস পাওয়ায় বুড়িগঙ্গায় অক্সিজেনের মাত্রা প্রায় পাঁচ মিলিগ্রামে পৌঁছেছে (প্রতি লিটারে প্রয়োজন ছয় মিলিগ্রাম দ্রবীভূত অক্সিজেন)। সরকারের পরিবেশ আইন সফল করতে হলে নাগরিকদের মননে ও চেতনায় পরিবেশবান্ধব হতে হবে। জাতি হিসেবে আমাদের মনোভাব ও আচরণে পরিবেশকে আমরা অবজ্ঞা করি অবলীলায়। জাতিগতভাবে আমাদের মননে ও মগজে আইন অমান্য করার বিষয়টি রয়েছে। ব্যক্তি বা সামাজিক জীবনে আমরা এখনো পরিবেশ-শিষ্টাচার আয়ত্ত করতে পারিনি। জরিমানা বা শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত মানুষ আইন মানতে চায় না। সমস্যাটি আমাদের মানসিক ও নৈতিক কিন্তু অভিঘাতে জর্জরিত হচ্ছে পরিবেশ।

একটি সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন সমাজের সূচকের পরিমাপে পরিবেশ রক্ষা অপরিহার্য অনুষঙ্গ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারিনি। চলমান করোনা মহামারিতে যদি যুক্ত হয় বর্জ্যের মহামারি, তাহলে আমাদের পরিবেশ-অবক্ষয় পূর্ণ হবে ষোলোকলায়। সুতরাং পরিবেশ আইন ও নির্দেশনা এবং জনগণের আইন মান্যতা একই বিন্দুতে আনতে হবে।

প্রবন্ধকার : মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী, মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

মেন্ডেলিভ ও আন্তর্জাতিক পর্যায় সারণি বর্ষ

জহুরুল হক বুলবুল

আমাদের কাছে যিনি দিমিত্রি মেন্ডেলিভ বা শুধু মেন্ডেলিভ নামে পরিচিত, তাঁর আসল নাম দিমিত্রি আইভানেভিশ মেন্ডেলায়েফ (Dmitri Ivanovich Mendeleyev)। বানান কোথাও দিমিত্রি মেন্ডেলিভ (Dmitri Mendeleef)। রুশ এ বিজ্ঞানী ১৮৬৯ সালে তাঁর পর্যায় সারণি প্রকাশ করেন। ২০১৯ সালে পর্যায় সারণির ১৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। তাই তাঁর সম্মানে ইউনেসকো আর আইইউপিএসি (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব পিউর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি) ২০১৯ সালকে আন্তর্জাতিক পর্যায় সারণি বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায় সারণি ২০১৯ উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মেন্ডেলিভের জীবন, কর্ম, সাধনা ও আদর্শ নিয়ে প্রচুর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, লেখালেখি হচ্ছে। পত্রপত্রিকায় ছাপানো হচ্ছে বিভিন্ন নিবন্ধ। তাঁর স্মরণার্থে ১০১ নম্বর মৌলের নাম হয়েছে মেন্ডেলিভিয়াস (Md)। বাংলাদেশেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন বিজ্ঞানী মেন্ডেলিভের কর্মময় জীবন নিয়ে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করেছে। একজন বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মকে বোঝার এই বিশ্বজোড়া আয়োজন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগায়, কী সেই বিশেষ গুণ ও কর্ম, যা মেন্ডেলিভকে এত সর্বজনীন ও শ্রদ্ধেয় করেছে।

বর্তমান যুগ যে বিজ্ঞানের যুগ, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতিদিন নানা জায়গায় নানাভাবে এ কথা উচ্চারিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের অনেক কিছু আমরা আলো-বাতাসের মতো সহজেই গ্রহণ করি, কিন্তু চিন্তা করি না। কিন্তু বিজ্ঞানের সেই উষালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত আসতে বিজ্ঞানীরা করেছেন অনেক সাধনা, লেগেছে অনেক সময়, পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ বন্ধুর পথ। আগুনের আবিষ্কার থেকে আজকের তথ্যপ্রযুক্তির যুগে পৌঁছে যাওয়া–এ সমস্তই অসংখ্য বিজ্ঞানীর অবদানের ফসল। এমনি করে বিজ্ঞানজগতে মৌলগুলোর পথচলা, আর এ পথচলা শুরু হয় পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারণি থেকে। গবেষণাগার থেকে শুরু করে বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর পড়ার টেবিল, ব্যাগে, জামায়–সব স্থানেই দেখা মিলবে এই সারণি।

উনবিংশ শতাব্দীতে রসায়নবিদেরা একটি সমস্যার সম্মুখীন হন। একের পর এক নতুন মৌল আবিষ্কৃত হতে থাকে। এতে রসায়নের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা এই নতুন মৌলগুলোর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম মনে রাখতে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েন। আবিষ্কৃত মৌলের সংখ্যা যখন ক্রমাগত বাড়তেই থাকল তখন প্রয়োজন দেখা দিল মৌলগুলোকে শ্রেণিতে ভাগ করা। নইলে সবই যে অগোছালো হয়ে যায়। বিভিন্ন বিজ্ঞানী চেষ্টা করতে লাগলেন ভিন্ন ভিন্ন মৌলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থির করা। শেষ পর্যন্ত ১৮৬৯ সালে রুশ বিজ্ঞানী মেন্ডেলিভ ৬৩টি মৌল নিয়ে প্রথম পর্যায় সারণি তৈরি করেন। এ সারণি তৈরি করেন মৌলগুলোর রাসায়নিক, বাহ্যিক গঠন ও পারমাণবিক ভরের ওপর ভিত্তি করে। এই সারণিতে সেগুলোর অবস্থান ঠিক করেন তিনি। একটা পেপারে কতগুলো সারি ও কলাম মিলিয়ে এই সারণি তৈরি করেন, যার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে আধুনিক সময়ের পর্যায় সারণি।

মেন্ডেলিভের পর্যায় সারণি যখন প্রকাশিত হয়, তখন মোট আবিষ্কৃত মৌলের সংখ্যা ছিল ৬৩। তখন পর্যন্ত অনেক মৌল অনাবিষ্কৃত। মেন্ডেলিভ অতি বিচক্ষণতার সাথে মৌলগুলোকে সাজাতে মাঝে মাঝে বেশ ফাঁকা জায়গা রেখে দেন। তাহলে ওই ফাঁকা ভরবে কী করে? মেন্ডেলিভ বললেন, ওই ঘরে নিশ্চয় মৌল আছে, যা আমরা এখনো খুঁজে পাইনি। এই স্থানগুলোতে বসানোর জন্য তিনি অনাবিষ্কৃত মৌলগুলোর অস্তিত্ব এবং তাদের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই মৌলসমূহ পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত হয়। মেন্ডেলিভের পর্যায় সারণি এতটাই কার্যকর ছিল যে, তিনি যা বলেছিলেন তার সাথে আবিষ্কৃত মৌলসমূহ ঠিক ঠিক মিলে গেল। আর মেন্ডেলিভের ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। গ্যালোনিয়াম, স্যানডিয়াম, জার্মেনিয়াম, টেকনিসিয়াম, রিহিনিয়াম ও পোলোনিয়াম এরূপ মৌলগুলোর অন্তর্গত।

পর্যায় সারণি ও মেন্ডেলিভ পরস্পর সমার্থক। পর্যায় সারণির জনক মেন্ডেলিভের জন্ম ১৮৩২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। রাশিয়ার সাম্রাজ্য সাইবেরিয়ার তবলস্কের ভার্খিনি আরেমজিয়েনি গ্রামে। তাঁর বাবা ইভান পাভলেভিচ মেন্ডেলিয়েভ এবং মা মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা মেন্ডেলিয়েভা। বিজ্ঞানী মেন্ডেলিভের দাদা পাভেল ম্যাক্সিমোভিচ রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের একজন ধর্মযাজক ছিলেন।

মেন্ডেলিভের সম্ভবত ১৪ বা ১৭ জন ভাইবোন ছিল, যার মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট। তাঁর বাবা ছিলেন চারুকলা, দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। মেন্ডেলিভের বাবা মাঝ বয়সেই অন্ধ হয়ে যান এবং চাকরি হারান। তাঁর মায়ের কাঁধে সংসারের হাল ধরার দায়িত্ব বর্তায়। তাঁর মা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে চাকরি নেন। মেন্ডেলিভের বয়স যখন ১৩ বছর, তাঁর বাবা দুর্ভাগ্যক্রমে মেন্ডেলিভের মায়ের কারখানায় আগুনে পুড়ে মারা যান। ওই সময় মেন্ডেলিভ তবলস্কের সাধারণ মানের জিমনেশিয়াম স্কুলের ছাত্র।

কিশোর মেন্ডেলিভ ভালো স্কুলে যেতে পারছে না। বয়স হয়ে যাচ্ছে। মা মারিয়া মেন্ডেলিভ খুব চিন্তিত। কী হবে এই পিতৃহারা সন্তানদের। যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মেন্ডেলিভ জন্মেছেন, সেখান থেকে মস্কোর দূরত্ব দেড় হাজার মাইল। চাট্টিখানি বিষয় নয়। সে সময় দেড় হাজার মাইল মানে হলো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। বিধবা মারিয়া শক্তি সঞ্চয় করছেন। তিনি ছেলেদের নিয়ে মস্কো যাবেন। তাদের পড়াশোনা

করাবেন ভালো প্রতিষ্ঠানে। এটাই তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। দিনের পর দিন তীব্র শীত উপেক্ষা করে অবশেষে ঘোড়ার গাড়িতে পৌঁছালেন মস্কো। সময়টা ১৮৪৯। মা মারিয়ার শরীর এ ধকল নিতে পারল না। অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন কিছুদিন পরই।

অসহায় মেন্ডেলিভকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করেনি। পুরো পরিবারসহ সেন্ট পিটার্সবার্গে চলে আসেন। মেন্ডেলিভ পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, যেখানে তিনি প্যাডাগজিক্যাল ইনস্টিটিউটে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে পড়াশোনা করেন। গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর তাঁর যক্ষ্মা হয় এবং তিনি ক্রিমিনি পেনিনসুলায় চলে যান, জায়গাটা ছিল কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে, সেখানে থাকাকালীন তিনি একটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ১৮৫৭ সালে মেন্ডেলিভ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে পুনরায় সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন।

১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত মেন্ডেলিভ তরলের কৈশিকতা ও বর্ণালিমাপক যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন। ওই সময় তিনি হিডেলবার্গে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৮৬১ সালে তিনি তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করেন, যা ছিল বর্ণালিমাপক যন্ত্র বিষয়ে। ১৮৬২ সালের এপ্রিলে তিনি ফেইজভা নিকিতিশনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মেন্ডেলিভ ১৮৬৪ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং পরে ১৮৬৫ সালে পিটার্সবার্গ স্টেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। পানি ও অ্যালকোহলের মধ্যে সংযোগ নিয়ে গবেষণায় তিনি ১৮৬৫ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৮৬৭ সালে বিশেষ একাডেমিক ক্ষমতা 'Tenure' পান। ১৮৭১ সালের মধ্যে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃতি ও স্বনামধন্য রাসায়নিক গবেষণাগারের অন্যতম কেন্দ্রে রূপান্তর করেন। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে সম্মানসূচক 'কোপালি মেডেল' প্রদান করেন।

মেন্ডেলিভ ১৮৭৬ সালের দিকে আনা ভানোভা পপোভা নামক এক নারীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং ১৮৮১ সালে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কথিত আছে যে – আনাকে তিনি আত্মহত্যার হুমকি দেন, যদি বিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। তিনি ১৮৮২ সালে তাঁর প্রথম স্ত্রী নিকিতিশনাকে ডিভোর্স দেন এবং পপোভাকে বিয়ে করেন। তাঁর ডিভোর্স, পুনঃবিবাহ এবং পারিপার্শ্বিক বিতর্ক তাঁকে রাশিয়ান সায়েন্স একাডেমির সদস্য হতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যদিও তাঁর কাজকর্ম পুরো ইউরোপে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ১৮৯০ সালের ১৭ আগস্ট বহু বিতর্ক ও বাদানুবাদের মুখে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গের শিক্ষকতা পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৮৯৩ সালে ব্যুরো অব ওয়েটস অ্যান্ড মেজারমেন্টস-এর ডিরেক্টর হন।

মেন্ডেলিভ পেট্রোলিয়াম সংযুক্তি অন্বেষণ করেন এবং রাশিয়ার প্রথম তেল শোধনাগার নির্মাণে বড় অবদান রাখেন। তাঁকে প্রথম পেট্রোলিয়াম জ্বালানি ব্যবহারের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। পর্যায় সারণির জনক ১৯০৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ৭২ বছর বয়সে পিটার্সবার্গে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে মেন্ডেলিভের মা ছেলেদের বলে গেছেন– তাঁরা যেন প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করে। তাঁরা যেন জ্ঞানের সন্ধানে জীবন কাটায়। মেন্ডেলিভ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মায়ের ত্যাগের কথা ভোলেননি। মায়ের প্রতিজ্ঞার কথা ভোলেননি। এ জন্য তিনি মস্কোতে বসে সারা দুনিয়ার কাছে তাঁর কর্মের দ্যুতি ছড়াতে পেরেছেন। মেন্ডেলিভ বহু লেখায় মায়ের কষ্টের কথা লিখেছেন।

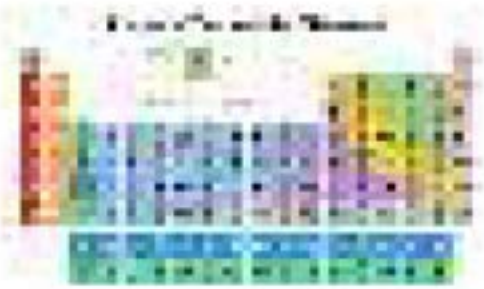

মেন্ডেলিভের সেই কালজয়ী পর্যায় সারণি কিন্তু সহজে এই আধুনিক সময়ে এসে পৌঁছায়নি। আবার মেন্ডেলিভের আগেও যে কেউ পর্যায় সারণি নিয়ে কাজ করেননি, তেমনটি কিন্তু নয়। মেন্ডেলিভের পর্যায় সারণির কয়েক দশক আগেই রসায়নবিদ জন ডাল্টন এ চেষ্টা করেন। তাঁদের সারণি তৈরির ধারণা একই রকম থাকলেও মেন্ডেলিভ তাঁর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন অন্য এক পথে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আরও অনেক মৌল আবিষ্কার করা বাকি। তাই তিনি ডাল্টন বা নিউল্যান্ডসের মতো গল্পের চরিত্রে শুধু ৬৩টি মৌলের চিন্তা করেননি। বরং ওইগুলো বাদে আরও কোনো মৌল আবিষ্কৃত হতে পারে, সেটি আন্দাজ করে সেগুলোর জন্য জায়গা ফাঁকা রেখেছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, পরে আবিষ্কৃত মৌলগুলো মেন্ডেলিভের অনুমেয় চিন্তার সাথে মিলে যায় এবং তাঁর রাখা ফাঁকা জায়গায় স্থান করে নেয়। এ পর্যন্ত ১১৮টি মৌল আবিষ্কার করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। অনেক পরিবর্তন শেষে উঠে আসে আজকের আধুনিক পর্যায় সারণি। এরপরও বিজ্ঞান গবেষণায় আজও মানুষের চিরসঙ্গী মেন্ডেলিভের বানানো পর্যায় সারণিই।

তাই বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম মেন্ডেলিভ। পর্যায় সারণির মতো এত চমৎকার উদ্ভাবন বিজ্ঞানে খুব বেশি নেই। প্রকৃতির সকল মৌলকে এমন বৈজ্ঞানিকভাবে, এত বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সাইজের কাগজে রেখে দেওয়া যায়, এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য। পর্যায় সারণির সৌন্দর্য উপলব্ধি করলে বোঝা যায় এর গভীরতা ও গুরুত্ব।

মেন্ডেলিভ ছিলেন ভাগ্য-প্রতারিত। হয়তো এজন্যই বিজ্ঞানে এত বড় অবদানের জন্যও তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিলে নোবেল পুরস্কার কমিটিই হয়তো ধন্য হতো। সে যা-ই হোক, তিনি বেঁচে আছেন তাঁর কাজে। এটি শুধু রসায়নের শিক্ষার্থী কিংবা গবেষকদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়। পর্যায় সারণি সর্বজনীন।

তথ্যনির্দেশক

১। বিজ্ঞানচিন্তা-মার্চ- ২০১৯
২। ছোটদের বুক অব নলেজ
৩। বিজ্ঞান বিশ্বকোষ– বাংলা একাডেমি।
৪। পারমাণবিক গঠন এবং পর্যায় সারণি– ড. কালিপদ কুণ্ডু
৫। ইন্টারনেট

প্রবন্ধকার : বিভাগীয় প্রধান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, কালিহাতী কলেজ, টাঙ্গাইল।

বিস্ময়কর কতিপয় বুদ্ধিমান প্রাণী

আমিনা বেগম

এই পৃথিবীতে বিচিত্র ধরনের প্রাণী বসবাস করে। একেক ধরনের প্রাণীর আচরণ, জীবনযাত্রা একেক রকম। কোটি কোটি প্রাণীর মধ্যে বিচিত্র কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মানুষ নিজেও কিন্তু একটি প্রাণী। যদিও সৃষ্টির সবচেয়ে উঁচু স্থানে রয়েছে মানুষ। এটা মূলত তাদের জ্ঞান–বুদ্ধি এবং শারীরিক গঠনের কারণে। তবে শারীরিক ক্ষমতার দিক দিয়ে মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই অনেক প্রাণীর চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। প্রাণিজগৎ মানুষের কাছে বরাবরই বিস্ময়কর। প্রায় প্রতিদিনই আমরা নতুন কিছু জানছি এ জগৎ সম্পর্কে। রহস্যময় এ জগৎ সম্পর্কে যেন জানার শেষ নেই। প্রায় প্রতিটি প্রাণীর কিছু বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে এবং এর মধ্যে কিছু খুবই বিস্ময়কর। কিন্তু এদের সম্পর্কে জানি না অনেক বিস্ময়কর তথ্য। মানুষ ছাড়াও আজ আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব এমন কিছু প্রাণীর সঙ্গে, যারা তাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতার জন্য বেশ প্রসিদ্ধ।

শিম্পাঞ্জিঃ শিম্পাঞ্জি primates বর্গের Pan প্রজাতির বানরজাতীয় এক প্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী। এদের মস্তিষ্কের আয়তন ২৮২-৫০০ সেমি। মস্তিষ্ক তার ওজনের ০.৯ শতাংশ। এদের মস্তিষ্ক বেশ উন্নত। তাই এরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী। এদের Pan paniscus কঙ্গো নদীর দক্ষিণে বাস করে। এরা বিভিন্নভাবে মানুষের নিকটাত্মীয়। শতকরা ৯৯ ভাগ শিম্পাঞ্জির জিন সংকেত মানুষের ঠিক অনুরূপ। স্বভাবেও এরা মানুষের মতোই সামাজিক। মানুষের মতোই এরা ভাবাবেগ প্রকাশ করতে পারে, নিজের স্বজাতির অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, প্রয়োজনমাফিক ছোটখাটো হাতিয়ার বানাতে পারে, এমনকি যুদ্ধেও অংশ নিতে পারে। শিম্পাঞ্জিরা খুবই বুদ্ধিমান। এরা মানুষ এবং স্বজাতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করতে পারে। কোনো নির্দেশ সামান্য প্রশিক্ষণেই এরা মেনে চলতে পারে। হলিউডি সিনেমায় শিম্পাঞ্জির ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়। এই প্রাণীটিকে মূল চরিত্র করে অনেক জননন্দিত চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। শিম্পাঞ্জির সঙ্গে মানুষের আরেকটি বড় মিল হলো উভয়েরই লেজ নেই। শিম্পাঞ্জিরা সারা দিনের অর্ধেক সময় কাটায় মাটিতে আর বাকি অর্ধেক সময় কাটায় গাছের ডালে। ওরা গাছের ডালে ডালপালা আর লতাপাতা দিয়ে এক রকমের বাসা তৈরি করে সেখানেই রাতের ঘুমটা সেরে নেয়। মজার ব্যাপার হলো, প্রতি রাতেই ওরা নতুন বাসা তৈরি করে। পুরোনো বাসায় আরেকটা রাত কাটানোর মোটেই আগ্রহ থাকে না।

ডলফিন : ডলফিন Cetacea বর্গের Odontocetei একধরনের সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। পৃথিবীতে ১৭টি গণে প্রায় ৪০টি প্রজাতির ডলফিন রয়েছে। পৃথিবীজুড়েই ডলফিন দেখা যায় বিশেষ করে

মহীসোপানের কাছের অগভীর সমুদ্রে। ডলফিনকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীদের কাতারে ধরা হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা মানবসমাজের কাছে ডলফিনকে খুবই জনপ্রিয় করে তুলেছে।

ডলফিন জলের সব থেকে বুদ্ধিমান প্রাণী। ডলফিনের মস্তিষ্ক তার ওজনের ০.৯ শতাংশ। শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কের মতো এদের মস্তিষ্ক বেশ উন্নত। প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে বানরের মতো এরাও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে। এমনকি সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় দেখা গেছে বয়স্ক ডলফিন থেকে বাচ্চা ডলফিন জ্ঞান আহরণ করতে পারে, ঠিক যেমনটা মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়। মিলিটারি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ডলফিনদের। ডুবে যাওয়া জাহাজের খোঁজ করার জন্য মানুষকে উদ্ধার করা জন্য এদের ব্যবহার করা হয়। সদা চলমান এই প্রাণীটিকে চলমান ক্যামেরা হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদের চলাচল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সীমান্ত পাহারার কাজও করছে নৌবাহিনী।

ডলফিনরা খুব কেয়ারিং। যখন কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় সে সাহায্যে আবেদন করে ডাক দেয়। তার এই ডাক যারাই শুনতে পায় তারাই ছুটে আসে সাহায্য করার জন্য। যখন কোন ডলফিন আহত হয় বা অসুস্থ হয়, তখন সঙ্গীরা তাকে ভেসে থাকতে সহায়তা করে, যাতে সে ডুবে না যায়। এই সহযোগিতা অনেক ডলফিন মানুষকেও করেছে। এই ধরনের উদাহরণ আছে অনেক, জাহাজডুবির পর ডলফিনরা দলবেঁধে মানুষদের উদ্ধার করে পাড়ে তুলে দিয়েছে।

হাতি : স্থলচর বা স্থলভাগের সর্ববৃহৎ প্রাণীর নাম হাতি। Proboscidea বর্গের একমাত্র জীবিত বংশধর। শুঁড়কে হাতের মতো ব্যবহার করতে পারার জন্য এদের নাম হাতি। পৃথিবীতে হাতির দুটি প্রজাতি রয়েছে। যথা– Elephas maximus ভারতীয় হাতি এবং Loxodonta Africana আফ্রিকা অঞ্চলের হাতি। আফ্রিকান হাতিরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আর তাদের মস্তিষ্কের নিওকর্টেক্সটা বড় আর বেশি সংবর্ত। তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে এক। তাদের মস্তিষ্কের ওজন ৫ কেজি, যা স্থলজ প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। হাতির মস্তিষ্কের গঠন আরো জটিল। হাতির সেরিব্রাল কর্টেক্স-এ মানুষের সমান স্নায়ুকোষ আছে। হাতিদের বুদ্ধি বেশ প্রখর। এরা এদের আত্মীয়স্বজনদের তাদের মাথার খুলি দেখে শনাক্ত করতে সক্ষম। যা অন্য কোনো প্রাণী পারে না বলেই চলে। এরা খুব সামাজিক প্রাণী পরিবারের সবাই একসাথে বসবাস করে। এদের কেউ মারা গেলে এরা মৃতদেহর প্রতি শোক পালন করে। মৃতদেহ পচা শুরু না হওয়া পর্যন্ত এরা মৃতদেহের পাশেই অবস্থান নেয়। হাতিরা আনেক ধরনের ব্যবহার প্রদর্শন করে, যেমন

শোক, শিক্ষা, পালন, অনুকরণ, খেলা, নিঃস্বার্থতা, সরঞ্জামের ব্যবহার, দয়া, সহযোগ, স্মৃতি–এসব হাতির বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শিত করে।

কুকুর : কুকুর কার্নিভোরা (Carnivora) বর্গের Canidae গোত্রভুক্ত এক প্রকারের মাংসাশি স্তন্যপায়ী প্রাণী। সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের জন্য সবচেয়ে বন্ধুবৎসল এবং কর্মঠ প্রাণী কুকুর। কুকুরের প্রজাতির সংখ্যা একশটিরও বেশি। পৃথিবীজুড়ে গৃহপালনের জন্য কুকুরের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রজাতি ল্যাব্রাডর। শুধু ঘরের কাজকর্ম নয়, পুলিশের কাজেও ল্যাব্রাডরের সহযোগিতা সর্বজনবিদিত। মানুষের চেয়ে কুকুরের শ্রবণশক্তি চার গুণ বেশি। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অতুলনীয়। সে গন্ধের সাহায্যে দুষ্ট লোকদেরও শনাক্ত করতে পারে। গবেষকরা বলেন, কুকুর গন্ধের সাহায্যে ক্যানসারসহ মানুষের বেশ কিছু রোগের উপস্থিতি বুঝতে পারে। একটি কুকুর সাধারণত ২৫০টির মতো শব্দ ও অঙ্গভঙ্গি বুঝতে সক্ষম। একটি পূর্ণবয়স্ক কুকুরের বুদ্ধিমত্তা একটি দুই বছরের শিশুর সমান। দিক নির্ণয় করতে কুকুরের কোনো কম্পাস দরকার হয় না। এছাড়া তারা বাদুড়ের মতো কিছু বিশেষ শব্দ শুনতে পায়, যা মানুষের পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। এসব কাজে লাগিয়েই তারা সঠিকভাবে দিক নির্ণয় করতে পারে। বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান কুকুরটির নাম চেসার। সে ১০০০টিরও বেশি শব্দ জানে।

শূকর : শূকর একটি পরিচিত গৃহপালিত প্রাণী, যা দুধ, মাংস, এমনকি পশমের চাহিদাও পূরণ করে থাকে। ইংরেজি নাম pig। শূকর Artiodactzla বর্গের Suidae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। শূকর এমন একটি প্রাণী, যারা পৃথিবীর অন্য যেকোনো প্রাণীর চেয়ে দ্রুত কিছু শিখতে পারে। যেকোনো নতুন জিনিস দ্রুত শিখে নেওয়ার ব্যাপারে শূকরের কোনো জুড়ি নেই। এই সম্পর্কে 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স'–এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'শূকররা সকল প্রাণীর মধ্যে সব থেকে দ্রুত যেকোনো দৈনন্দিন কাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তারা সার্কাসের বিভিন্ন কলাকৌশল যেমন রিংয়ের ও মধ্য দিয়ে লাফ দেওয়া, সোজা হয়ে দাঁড়ানো, দর্শকদের সামনে মাথা নত করা, বিভিন্ন নির্দেশে অর্থবহ শব্দের মাধ্যমে সাড়া দেওয়া, খাঁচা খোলা ও বন্ধ করা ইত্যাদি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করে থাকে। এমনকি তারা জয়স্টিকের সাহায্যে বিভিন্ন ভিডিও গেমসের খেলাও খেলতে পারে।

ভোঁদড় : ভোঁদড় বা উদ্‌বিড়াল কয়েক ধরনের আধা জলচর (এবং একটি ক্ষেত্রে জলচর) প্রধানত মৎস্যভুক

স্তন্যপায়ী প্রাণী। ভোঁদড় বলতে Mustelidae গোত্রের Lutrinae উপগোত্রের প্রাণীগুলোকে বোঝায়, যার মধ্যে আরও আছে উদ্‌বিড়াল, নেউল বা বেজি, ব্যাজার ইত্যাদি। ভোঁদড় সমাজবদ্ধ জীব। এরা বেশ ক্রীড়াপ্রবণও। ভোঁদড়ের মধ্যেও যে শিল্পীর প্রতিভা লুকিয়ে থাকতে পারে, তা অনেকেরই অজানা। ঘটনাটি হলো দুবাই অ্যাকুয়ারিয়াম এবং আন্ডারওয়াটার চিড়িয়াখানার দুইটি ভোঁদড়কে ছবি আঁকা শেখানোর পরিকল্পনা করে কর্তৃপক্ষ। একসময় তারা সফলও হয়। দর্শকের সামনে ছবি এঁকে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেয় ভোঁদড় দুটি।

বুদ্ধিমান এই প্রাণীগুলো বেশ বন্ধুবৎসল এবং সহজেই পোষ মানে। অনেক স্থানে, বিশেষত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ও সুন্দরবন এলাকায় পোষা ভোঁদড় দিয়ে মাছ শিকার করতেও দেখা যায়। ভোঁদড়দের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যেন এরা পানিতে ডুব দিয়ে মাছ ধরে জেলের কাছে নিয়ে আসে। তাই প্রশিক্ষিত ভোঁদড়দের হাতে ধরা বাঁশে বা নৌকার গলুইয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে পানিতে নামিয়ে দেওয়া হয় বা জেলের ইশারা পেলেই পানিতে লাফিয়ে পড়ে ভোঁদড়। কিছুক্ষণ পরেই মুখে মাছ নিয়ে পানি থেকে উঠে আসে এক একটি ভোঁদড়। এই ভোঁদড়দের সাহায্যেই জেলেরা ১২-১৫ কেজি ওজনের মাছ যেমন ধরে, তেমনি গলদা চিংড়ি এবং কাঁকড়াও ধরে।

ধূসর তোতা : পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীর তালিকায় রয়েছে আফ্রিকান ধূসর তোতা পাখি। এদের পাখি জগতের আইনস্টাইন বলা হয়। এরা অত্যন্ত চালাক একটি পাখি। গবেষণায় দেখা গেছে এরা বিমূর্ত ও সিদ্ধান্তলব্ধ যুক্তি ক্ষমতার অধিকারী। এরা মানুষের কণ্ঠ নকল করতে পারে এবং মানুষের নির্দেশনা বুঝে বিভিন্ন কাজ করতে পারে। গবেষণা অনুযায়ী, এদের বুদ্ধিমত্তা ৪ থেকে ৬ বছর বয়সী মানুষের বাচ্চার বুদ্ধির সমমান। আর এদের বুদ্ধিমত্তা, মানুষের মতো কথা বলা ইত্যাদি কারণেই সমগ্র পৃথিবীতে এরা জনপ্রিয় পোষা পাখি হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছে। এ কারণে দেখবেন আগের দিনের জলদস্যুরা একটা করে তোতা পাখি পুষত। তৎকালীন সময়ে মনে করা হতো এই তোতা পাখি জাহাজের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে জাহাজের সব খবরাখবর জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলে। তাছাড়া বর্তমান সময়ে দেখা গেছে এই তোতা পাখি ৫০টি ভিন্ন ভিন্ন রঙের এবং আকৃতির বস্তু চিনতে সক্ষম।

কাক : কাক Passeriformes বর্গের Corvidae গোত্রের সর্বভুক পাখি। কাক সাধারণত কর্কশ ও কুৎসিত পাখি হিসেবে পরিচিত হলেও প্রাণীসমাজে তাদের যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাক যে শুধু তাদের নিজেদের নানা রকম সমস্যার সমাধান করতে পারে, তা-ই নয়। কোনো কিছু দ্রুত শিখতে

পারার ক্ষমতাও এদের প্রবল। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, কাক যেসব মানুষকে নিজেদের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করে তাদের চেহারা পর্যন্ত এরা মনে রাখতে পারে। শুধু তা-ই নয়, গবেষণায় শেষ পর্যন্ত এটাও লক্ষ করা গেছে, কোনো একজন ব্যক্তি যদি একটি কাকের ক্ষতি করে থাকে, তবে ওই এলাকার সব কাকই ওই ব্যক্তিকে নিজেদের শত্রু বলে মনে করে। এমনকি সেই ব্যক্তিটি যদি ওই এলাকার সব কাকের মুখোমুখি না-ও হয়ে থাকে, তারপরও তার সাথে এমনটাই ঘটে।

বানর বা শিম্পাঞ্জি যেমন পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে জটিল হিসাব-নিকাশ করে, তেমনি কাকও খুব দুর্দান্তভাবে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে যেকোনো পরিস্থিতিতে। খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য কাক দুই ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। প্রথমত, এরা বাঁকানো ডালপালা সংগ্রহ করে। এরপর গাছের গায়ে গর্ত থাকলে ওই ডালপালা দিয়ে খোঁচায়। উদ্দেশ্য, গর্তের ভেতর শুঁয়োপোকা থাকলে তা বের করে আনা এবং খাবার হিসেবে তা গ্রহণ করা। গাছের গর্ত থেকে শিকার ধরতে বাঁকানো ডাল ব্যবহার করে কাক। দ্বিতীয়ত, এরা শক্ত পাতাকে টুকরো টুকরো করে সেগুলো দিয়ে পোকা বা অমেরুদণ্ডী প্রাণী শিকার করে থাকে। এমনকি শিকার ধরতে এরা সোজা কোনো ধাতব তার বাঁকিয়ে হুক বানানোর কৌশলও আয়ত্ত করতে সক্ষম।

অক্টোপাস : অক্টোপাস আটটি বাহুবিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণী। দেখতে শামুকের মতো না হলেও (শক্ত খোলস নেই) এরা শামুক-ঝিনুকের জাতভাই অর্থাৎ মোলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এদের মাথার ঠিক পেছনেই আটটি শুঁড়-পা আছে, তাই এরা সেফালোপডা বা 'মস্তক-পদ' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এরা নিশাচর, সাধারণত ধীর গতিসম্পন্ন। প্রায় ১৫০ প্রজাতির ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের অক্টোপাস রয়েছে। অমেরুদণ্ডীদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম মস্তিষ্ক হলো অক্টোপাসের। একটা সাধারণ অক্টোপাসের ১৩০ মিলিয়ন নিউরন রয়েছে, এর মধ্যে ৩/৫ অংশ নিউরন রয়েছে এদের বাহুগুলোতে অর্থাৎ প্রত্যেক বাহুর নিজস্ব মন আছে। এজন্যই এদের বাহু কেটে ফেললে আবার জন্মায়।

অক্টোপাসের আত্মরক্ষার কৌশল বেশ অদ্ভুত। এরা ইচ্ছেমতো নিজের দেহের রং পরিবর্তন এবং মাথার নিচের নলাকার ফানেল জলপূর্ণ করে দ্রুতবেগে বের করে দিয়ে তাড়াতাড়ি দূরে সরে যেতে পারে। রং পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রতলের বালু, পাথর, উদ্ভিদ ইত্যাদির সাথে এমনভাবে মিশে যেতে পারে যে হাঙর, ইল, ফিন (অক্টোপাসের প্রধান শত্রু) খুব কাছ থেকেও একে শনাক্ত করতে পারে না। এছাড়া এদের দেহে কালি থলে (ink sac) থাকে, যার সাহায্যে অক্টোপাস নিজের দেহ থেকে ঘন কালো কালি ছুড়ে দিতে পারে, যা শত্রুকে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ করে দেয়। এ কালির আরেকটি গুণ হচ্ছে এটি শত্রুর ঘ্রাণশক্তিও কিছুক্ষণের জন্য নষ্ট করে দেয়। ফলে অক্টোপাসটি পালিয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার কোনো উপায় না পেলে অনেক সময় এরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অথবা নিজের বাহু খেতে আরম্ভ করে। অক্টোপাস খুব দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে, যা এটির আত্মরক্ষায় সহায়ক।

পিঁপড়া : পিঁপড়া ক্ষুদ্র হলেও আমাদের কর্মী হওয়ার শিক্ষা দেয়। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবার শিক্ষাও পাওয়া যায় পিঁপড়া থেকে। পবিত্র কোরআনে একটি সুরার নাম হচ্ছে নমল, যার অর্থ পিঁপড়া। বাইবেলেও পরিশ্রমী হওয়ার জন্য পিঁপড়ার কাছে যেতে বলা হয়েছে। সত্যিই ছোট্ট একটি প্রাণীও যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা ভেবে অবাক হতে হয়। পিঁপড়া (Ant) Insecta শ্রেণির Hzmenoptera বর্গের Formicidae গোত্রের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বে পিঁপড়ার প্রায় ১২ হাজার প্রজাতি রয়েছে। পোকামাকড়ের

মধ্যে সবচেয়ে বড় মস্তিষ্কের অধিকারী পিঁপড়া। তাই পিঁপড়া খুবই ধূর্ত প্রকৃতির প্রাণী। এরা সংঘবদ্ধভাবে সামাজিকভাবে বসবাস করে, আর এদের সামাজিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তর থাকে, আর প্রতিটি স্তরের সদস্যদের কাজের সীমানা ভিন্ন ভিন্ন হয়। পিঁপড়া সর্বদা একই রেখায় চলতে থাকে। চলার পথে প্রতিটি পিঁপড়াই একধরনের তরল পদার্থ (ফেরোমন) নির্গত করে। ফলে পেছনে থাকা পিঁপড়াগুলো সামনেরগুলোকে অনুসরণ করতে পারে। পিঁপড়ার হাঁটু এবং পায়ে আছে বিশেষ এক ধরনের সেনসিং ভাইব্রেসন, যার মাধ্যমে আশপাশের পরিস্থিতি পিঁপড়ারা বুঝতে পারে। যখন একটি পিঁপড়া মারা যায় তখন তার শরীর থেকে একধরনের রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়। ফলে অন্য পিঁপড়ারা সহজেই মৃত পিঁপড়া সম্পর্কে তথ্য পেয়ে যায়। পিঁপড়ার কান নেই। তাই মাটির কম্পন থেকেই শব্দের ব্যাপারটি বুঝে নেয়। মানুষ ও পিঁপড়ার মাঝে একস্থানে মিল পাওয়া যায়। উভয়েই খাদ্য মজুত করে রাখে। এই প্রাণীটি তার শরীরের ওজনের চেয়েও ২০ গুণ বেশি ওজন বহন করতে পারে।

উন্নত মস্তিষ্কের এসব বিস্ময়কর প্রাণীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত জীবনযাপন ও কলাকৌশল মানুষকে মুগ্ধ করেছে। মানুষও এসব প্রাণীর প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করছে। বর্তমানে মানুষ অবাধে এই প্রাণীদের ধরা ও শিকারি এবং বাসস্থান ধ্বংসের কারণে অনেক প্রজাতি হুমকির সম্মুখীন। তাই এসব প্রাণীর বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করতে সুষ্ঠু সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

Ref.

1. Verma, P.S 1997. A Manual of Practical Zoology: Chordata. S. Chand & Company Ltd. Ramnagar, India.
2. Spelman, Lucz H. Animal Encyclopedia: 2,500 Animals with Photos, Maps, and More! National Geographic, 2012.
3. Animal Diversity Web, www.learnnc.org/lp/external/1798?stzle=print.
4. http://www.iaszoology.com/the-ants/
5. Dr. Altaf Hossain, Dr. Shapon Kumar Datto-2005, Animal Diversity: Chordata, Mallik Brothers Dhaka

প্রবন্ধকার : প্রভাষক, জীববিজ্ঞান বিভাগ, মৌলানা মুফজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রি কলেজ, রাজনগর, মৌলভীবাজার।

বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা

নিশাত বেগম

আমরা বর্তমানে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি দ্বারা আরোপিত, দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে বসবাস করছি। বাংলাদেশের মতো একটি দেশের বিকাশের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে জনসংখ্যা বেশি, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ কম। আমরা এই বৃহৎ জনসংখ্যাকে দক্ষ জনবলে রূপান্তরিত করে দেশের একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারি। এটা করার জন্য বিজ্ঞান গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে বিজ্ঞান গবেষণায় অনেক বাধা আছে। বাংলাদেশে শিক্ষার তিনটি প্রধান স্তর রয়েছে – প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা নবম ক্লাস থেকে দ্বাদশ ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যমান। মাধ্যমিক স্তরের অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থীরা উচ্চতর অধ্যয়নের বিভিন্ন শাখা নির্বাচন করতে পারে। সাধারণ শিক্ষাপ্রবাহে, উচ্চমাধ্যমিকের পর কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকে অনুসরণ করা হয়ে থাকে (Ministry of Education, ২০১৫)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেকোনো দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশ্বায়ন দ্বারা সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিকদের সরবরাহের প্রয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করে বাংলাদেশ জনশক্তির উন্নয়ন ও জনশক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে (Alam, ২০০৯)। যদিও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান (pure science and applied science) নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে; কিন্তু অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গবেষণার (research in science education) মোট সংখ্যা অনেক কম। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Institute of Education and Research, IER, DU) বিজ্ঞান বিভাগ এবং পাবলিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের এম.এড প্রশিক্ষণার্থীরা বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে পরিচালিত কিছু গবেষণা করে থাকেন।

আইইআরের গবেষণা ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে – শিক্ষাগত প্রযুক্তি (Educational technology), বিজ্ঞান শিক্ষা-শিখন (Science teaching-learning), বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম (Science curriculum), বিজ্ঞান এবং তার সম্পর্কের অর্জন (Achievement of science and its correlates), বিজ্ঞান শিক্ষা মূল্যায়ন (Assessment of science education), পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন (Textbook evaluation), অবকাঠামোগত উপযোগিতা (Physical facilities) (Begum & Tapan, ১৯৯২, as citcd in Tapan, ২০১০)। তাছাড়া মোনাশ ইউনিভার্সিটি (Monash University), অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশি পিএইচডি ছাত্ররাও বাংলাদেশের বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্র নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন (Rahman, ২০১১ & Sarkar, ২০১২)।

আলম (২০০৯) দাবি করেন যে, 'বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে এখনও সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সাথে ভালোভাবে সাড়া দেওয়া এবং এই ধরনের শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়নি, যা কিনা মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন আনার পূর্বশর্ত। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান

শিক্ষার্থীর মধ্যে ভর্তি-নিবন্ধন ১০ বছর ধরে ক্রমাগত নিচের দিকে পতিত হয়েছে। 'অতএব, যদি এই প্রবণতা চলতে থাকে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য বিজ্ঞানী সংকট তৈরি হবে। অতীতে, শক্তিশালী বিজ্ঞান ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিজ্ঞান শিক্ষক নির্বাচন করা হতো, কিন্তু এখন বাংলাদেশের ছাত্ররা গণিত ছাড়াই বিএসসি (B.Sc) ডিগ্রি অর্জন করতে পারে। খারাপ মানের শিক্ষকতা বর্তমানের বিজ্ঞান শিক্ষাকে অযৌক্তিক ও কঠিন করে তুলছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক কাজের অভাব, অপর্যাপ্ত পরীক্ষাগার, অপর্যাপ্ত ইন্টারনেট সুবিধা এবং অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত কাজের চাপ ছাত্রদের উচ্চতর গবেষণায় অ-বিজ্ঞান (non-science) বিষয় গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আমাদের দেশে তাদের পণ্য বিক্রি করার জন্য আমাদের লোকদের বিক্রয় প্রতিনিধির চাকরি দিয়ে থাকে, যা কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে বটে কিন্তু ছাত্রদের আকর্ষণ করে ব্যবসায় শিক্ষায় অথবা এই ধরনের অ-বিজ্ঞান শিক্ষায় অধ্যয়নের জন্য। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের অর্ধেকেরও বেশি একটি সাধারণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ (BBA) স্টাডিজে তালিকাভুক্ত হয়ে চমৎকার গ্রেড অর্জনে সক্ষম হয়। যা পরবর্তী সময়ে উচ্চ মানের বা বেতনের কাজ পাওয়ার জন্য সহায়তা করে থাকে।

জুন ২০০৮-এ বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস এবং ডেইলি স্টার পত্রিকা (Bangladesh Academy of Sciences and Daily Star newspaper) দ্বারা আয়োজিত একটি গোলটেবিল আলোচনায় শিক্ষক ও সাধারণ মানুষের মতামত দ্বারা কিছু পরামর্শ তৈরি করা হয়েছিল, যেমন–

- নিয়োগের আগে বিজ্ঞান শিক্ষকের মান নিশ্চিত করা,
- নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া,
- বিজ্ঞান মেলা এবং বিজ্ঞান সপ্তাহ আয়োজন করা,
- সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (problem solving method) প্রবর্তন করা।

Figure ১. Female enrolment in different disciplines in Dhaka University, ২০০৪-২০০৭ (Shamima, ২০০৯) p-৮৩

রশিদ (২০০১, as cited in Tapan, ২০১০) বিজ্ঞান শিক্ষায় কন্টেন্ট (science content), বাস্তব কাজ (practical work), শিক্ষণ পদ্ধতি (teaching methods) ও মূল্যায়নের (assessment)

ওপর জোর দিয়েছিলেন। অপর দিকে, মন্ডল (২০০১, as cited in Tapan, ২০১০) বাংলাদেশে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য শিক্ষণ সহায়ক/উপকরণ (teaching aids) এর অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, বারী (Bari, ২০০৭, as cited in Tapan, ২০১০) দেখেছেন যে, বাংলাদেশের বেশির ভাগ স্কুলে শিক্ষণ উপকরণ নেই এবং কিছু স্কুলে তা অনুপযুক্ত সংরক্ষণ পদ্ধতির কারণে অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়েছে।

ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তৈরি করতে এবং নেতৃত্বের মান বিকাশ করতে, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে সৃজনশীলতা, অনুশীলন যোগ্যতা এবং উৎপাদনশীলতার (Creativity, practicability and productivity) ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া অগ্রাধিকার দেওয়া হয় জ্ঞানচর্চা করা, বিজ্ঞান গবেষণায় ছাত্রদের প্রেরণা দেওয়া এবং উচ্চতর গবেষণায় মানের (quality) নিশ্চিত করার ওপর। নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিশ্বের সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধির বড় রকমের পরিবর্তন করতে পেরেছে। ঐতিহ্যগত (traditional) উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা এই অঞ্চলের ডিজিটাল বিভক্তি (digital divide) হ্রাসে যথেষ্ট নয়। অতএব, বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানভিত্তিক সংস্কার প্রয়োজন। ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রকৌশল শিক্ষার একাডেমিক পাঠ্যক্রমটি (curriculum of Engineering) যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন করা উচিত (National Education Policy, ২০১০)।

বিজ্ঞান সাক্ষরতা সম্পর্কে শিক্ষকদের সহজাত (naive) ধারণাসহ বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিভঙ্গি আছে। যেমন, বেশির ভাগ বিজ্ঞান-শিক্ষক মনে করেন যে, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, ছাত্ররা তাদের বাস্তব জীবনে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে; ভবিষ্যতের পেশাদার বিজ্ঞানী বানানোর উদ্দেশ্য তাদের নেই (Corrigan & Sarka, ২০১৩)। তাদের নিজস্ব একাডেমিক ও পেশাদার বিজ্ঞান ব্যাকগ্রাউন্ড দুর্বল থাকায়, পাঠ্যক্রম-শনাক্তকারী মানের (curriculum-identified values) ধারণা নিতে গিয়ে (conceptualising) এবং তারপর উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি বাস্তবায়নে বিজ্ঞান শিক্ষকগণ অসুবিধায় পড়েন। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা ধারণা অস্পষ্ট (Sarkar, ২০১২)।

Nelleke, et al. এবং Tsai-এর মতে, কম তালিকাভুক্তি (enrolment) এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় কম আগ্রহ, বিজ্ঞান যেভাবে শেখানো হয় তার সঙ্গে সম্পর্কিত। ছাত্ররা প্রায়ই বিজ্ঞানকে সীমিত হিসেবে খুঁজে পায়, কারণ বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের বেশির ভাগ বিষয় শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত হয় (Nelleke, et al. ২০১০, & Tasi, ২০০২, as cited in Siddiquee, ২০১৩). যদিও বাংলাদেশের বিজ্ঞান শিক্ষকদের শিক্ষণ এবং শেখার (teaching and learning) পাঠ্যক্রমের দৃশ্যরূপ সম্পর্কে আধুনিক বিশ্বাস আছে, কিন্তু সামাজিক বাধার জন্য তারা এটা প্রয়োগ করতে পারেন না (Siddiquee, ২০১৩). Lewin এবং Ware, তাদের লেখায় (Lewin, ১৯৯২, & Ware, ১৯৯৯, as cited in Siddique, ২০০৮), ১৯৯০-এর দশকের, উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন দেখান, যেখানে তিনটি প্রধান প্রবণতা দেখানো হয়েছিল :

- শুধু ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী নয়, সব শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞান,

- কন্টেন্টের সংজ্ঞা বাড়ানো হয়েছিল এবং
- প্রাকৃতিক বিশ্বকে বুঝতে নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল।

সিদ্দিক (২০০৮) বাংলাদেশের বর্তমান এবং প্রস্তাবিত বিজ্ঞানের পাঠক্রম বিশ্লেষণ করে খুঁজে পান যে,

- বিজ্ঞান-সম্পর্কিত ধারণাগুলো বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের (pure science) ওপর ভিত্তি গঠন করা হয়,
- বিষয়বস্তু বর্ণনামূলক এবং বাস্তবিক হয়,
- বর্তমান পাঠ্যক্রমে ব্যবহারিক অন্তর্ভুক্ত কিন্তু সমস্যা বিশ্লেষণের মতো বুদ্ধিবৃত্তিক থিম উপেক্ষিত

প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচিতে -

- বিশুদ্ধ ও প্রয়োগযোগ্য (applied) কন্টেন্টের সমন্বয় করা হয়,
- বুদ্ধিভিত্তিক ও বাস্তব প্রক্রিয়া উভয়ের দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়,
- যোগাযোগ দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা এবং সহযোগিতার দক্ষতার প্রবর্তন করা হয় এবং
- স্কুল বেস অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম (School Base Assessment (SBA) system) প্রবর্তন করা হয়।

বেগম (২০০৮) মনে করেন যে, ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা স্মরণ করা বা মুখস্থ করার দক্ষতার ওপর নির্ভর করে, যা তাদের নিষ্ফলা করে তোলে এবং তারা ভবিষ্যতের জন্য সম্পূর্ণরূপে অবদান রাখতে বিফল হয়। জুন ২০০৭ সালে বাংলাদেশ সরকার জুনিয়র মাধ্যমিক পর্যায়ে এসবিএ পদ্ধতি চালু করেছিল, যদিও সব শিক্ষক সেই সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেনি। সুতরাং, নতুন শিক্ষাব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন সম্পর্কে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। ২১ জুলাই, ২০১৩– এ বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা এবং উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে "Review of the revised curriculum materials and recommendations for future improvements of 21st century mathematics and science education in Bangladesh" –এর ওপর একটি যৌথ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তোদা (২০১৩, অনুচ্ছেদ ৪) প্রস্তাব করেছিলেন, পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকগুলো আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সমন্বয় করা উচিত, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার মান নিশ্চিত করা উচিত এবং হাতের (hands-on) পাঠ্যক্রমের ওপর জোর দেওয়া উচিত।

গবেষণায় দেখা যায় যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্লাসের আকার (প্রতি ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা) বিশাল; প্রতি ক্লাসে প্রায়ই শতাধিক ছাত্র থাকে, যদিও বাংলাদেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাবিত সংখ্যা প্রতি ক্লাসে ষাটজন। একজন বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রতি সপ্তাহে প্রায় সাতশত ক্লাস নিতে হয়। কখনও কখনও অন্যান্য শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তাদের অতিরিক্ত ক্লাসও নিতে হয়। তাছাড়া, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষককে একই সময়ে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত ও জীববিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হয়। অতএব, তাদের ক্লাসের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতির সময় নেই। যদিও শিক্ষাদান লোড এবং সীমাবদ্ধ সম্পদ (limited resources) রয়েছে, তবু গঠনমূলক (constructivist) শিক্ষার পদ্ধতি বাংলাদেশে কাজ করবে (রহমান, ২০১১)। আবার, বিজ্ঞান শিক্ষককে অন্যান্য অ-বিজ্ঞান শিক্ষকের তুলনায় কাজের লোড বাড়িয়ে পরীক্ষাগারের ক্লাস পরিচালনা

করতে হয়। গবেষণাগারে অধিকাংশ সময় পুরোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, যা প্রত্যাশিত ফলাফল দেয় না।

বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর অনেক সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৫ সালের ২৬ এপ্রিল, তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বর্তমানে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন প্রদর্শন-বস্তুর প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করা এবং নবীন ও অপেশাদার বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ৭টি গ্যালারি রয়েছে (National Muscum of Scicnce and Tcchnology, ২০১৮)। গ্যালারিগুলো হলো :

১. ভৌত বিজ্ঞান গ্যালারি
২. শিল্পপ্রযুক্তি গ্যালারি
৩. জীববিজ্ঞান গ্যালারি
৪. তথ্যপ্রযুক্তি গ্যালারি
৫. মজার বিজ্ঞান গ্যালারি-১
৬. মজার বিজ্ঞান গ্যালারি-২
৭. মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি

তাছাড়া রয়েছে সৌর বাগান, আকাশ পর্যবেক্ষণ মানমন্দির এবং বিজ্ঞান গ্রন্থাগার। জাদুঘর জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতামালা, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। বিজ্ঞান জাদুঘর তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনীমূলক কাজে সহায়তা করে থাকে।

ছবি : জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সৌর বাগান।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান অনুরাগ ও বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করা এবং এই জন্য–

- জাদুঘরে স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনী স্থাপন করা;
- বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞানবিষয়ক নানাবিধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;
- ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;
- বক্তৃতামালা, সেমিনার ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করা;
- স্কুল ও কলেজসমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা;
- বিজ্ঞান শিক্ষার যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- নবীন ও শৌখিন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা;
- দেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বিজ্ঞান আন্দোলনকে জোরদার করা;
- বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ইতিহাস তুলে ধরা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক নিদর্শনাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রায়োগিক ব্যবস্থা করা;
- মানবজাতির কল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানের ও বিজ্ঞানীদের কীর্তিসমূহের ভূমিকা সঠিকভাবে উপলব্ধিতে জনসাধারণকে সাহায্য করা।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বিশ্ব মানের বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা;
- আরও মিউজুবাস সংগ্রহ করা;
- ঢাকা ছাড়া অন্য বিভাগীয় সদরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের শাখা স্থাপন;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভবন নির্মাণ।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রকাশনা

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকা, জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতামালার গ্রন্থ, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের বার্ষিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক কার্যক্রমের ওপর পোস্টার ও লিফলেট প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জসমূহ

- বিজ্ঞান জাদুঘর, লাইব্রেরি, বিজ্ঞান গবেষণার জন্য পরীক্ষাগারের ভৌত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা,

- বিদ্যালয় এবং কলেজের পরীক্ষাগার ও ইন্টারনেট সুবিধা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়ন করা,
- বিদ্যালয় এবং কলেজের ব্যবহারিক ক্লাস যথারীতি হচ্ছে কি না তা তদারকি করা,
- বিদ্যালয় এবং কলেজের বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা,
- বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে বিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্রদের ধারণা দেওয়া,
- বিদ্যালয় এবং কলেজের আর্থিক তহবিল গঠন, স্টাফ প্রশিক্ষণ,
- ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ পূরণের বিজ্ঞান পাঠ্যক্রম তৈরি এবং পাঠক্রমের উন্নয়ন,
- বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, জনগণের সমর্থন ও সাহায্য জোগাড় করা,
- বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে নতুন নতুন আকর্ষণীয় প্রদর্শনবস্তু তৈরি ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা,
- বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার, সভা, আলোচনার আয়োজন করা,
- বিদ্যালয় এবং কলেজের মাঠে রাতে আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

References:

Alam, G.M. (2009). The role of science and technology education at network age population for sustainable development of Bangladesh through human resource advancement. Scientific Research and Essay. 4 (11), 1260-1270.

Begum, M. (2008). School Based Assessment: Will it really change the education scenario in Bangladesh ? International Education Studies, 1(2), 50.

Corrigan, d. & Sarkar, M. (2013). Bangladeshi science teachers' perspectives of scientific literacy and teaching practices. Citation: AIP Conference Proceedings 1119, 83 (2009); doi: 10.1063/1.3137919

Ministry of Education, Bangladesh, Retrieved from http://www.moedu.gov.bd/ 26 January, 2015.

National Education Policy 2010, 9-31.

National Museum of Science and Technology, Retrieved from https://nmst.gov.bd/ 11 November, 2018.

Rahman, S.M.H. (2011). Professional learning of secondary science teachers in Bangladesh (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest Dissertations and Theses. 20-262.

Sarkar, M. M. A. (2012). Promotion of scientific literacy in Bangladesh: Teacher' perspectives, practices and challenges (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest Dissertations and Theses. 244-245.

Shamima, K. C. (2009). Problems and prospects of science education in Bangladesh. AIP Conference Proceedings. Retrieved from Proquest.1119, 83.

Siddiquee, M. N. E. A. (2013). Science teachers' beliefs on teaching and learning at secondary school in Bangladesh. GSE Journal of education (ISSN 2289-3970)

Siddique, M. N. A. (2008). The proposed reform of secondary education in Bangladesh: Is science neglected or promoted. 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia.

Tapan, M. S. M. (2010). Science education in Bangladesh. In Y.-J. Lee (Ed.), World of science education: Science education research in Asia. Rotterdam, Netherlands: Sense. 17-34.

Toda, T. (2013) para. 4, Japan International Cooperation Agency. Retrievd at July 21, 2013

প্রবন্ধকার : সাবেক কিউরেটর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, ঢাকা।

জিনের কাজ করা না করা

ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

জিন যে কাজ করে, এ কথা আমরা জানি। জিন কাজ করে বলেই জীব বেঁচে থাকে। জিন কাজ করে বলেই জীবের নানা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। জীবের বৃদ্ধি ও বিকাশ, জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় হাজারো জৈবিক বিক্রিয়া সম্পাদন এবং দেহের ক্ষয়পূরণ ও প্রতিরক্ষা প্রদানের জন্য জিনকে কাজ করতে হয়। তবে জীবের সব জিনই যে একসাথে কাজ করে, ব্যাপারটি কিন্তু তা নয়। জিনের কাজ করা আর না করাটা নির্ভর করে কতগুলো শর্ত পূরণের ওপর। জিনের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা এবং পরিবেশ পেলে তবে জিন কাজ করে। আবার দেহের কোনো জৈবিক কর্মকাণ্ডের চাহিদার প্রেক্ষাপটেও জিন কাজ করে। তবে কোনো কোনো জিন কাজ করে অহর্নিশি। আমাদের লালাগ্রন্থি থেকে প্রতিনিয়তই এনজাইম তৈরি হয়। খাদ্য পরিপাকের সময় প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈরির জন্য দায়ী জিনও অবিরত কাজ করে থাকে। এসব জিনকে ইংরেজিতে 'হাউজ কিপিং' জিন বলা হয়। বাংলায় এদের 'ঘর সামলানো' জিন নামে অভিহিত করা যায়। দেহের জন্য অতি জরুরি এবং অবিরত ক্রিয়াশীল জিন এই শ্রেণিতে পড়ে। দেহের সার্বক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর চাহিদা রয়েছে বলে এরা অবিরত কাজ করে। অনেক জিন আছে আবার বিশেষ প্রয়োজনে কেবল কাজ করে থাকে। সুনির্দিষ্ট পরিবেশ ও প্রণোদনা যখন পায়, তখন সেসব জিন কর্মক্ষম হয়। বাস্তবে এ রকম জিনের সংখ্যাই বেশি।

কোনো জীবের কোষের মধ্যে যত জিন রয়েছে সবই যে একসঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়, তা কিন্তু নয়। উচ্চ শ্রেণির জীবের ক্ষেত্রে কোষের কার্য বিভাজন রয়েছে। চাহিদামাফিক অঙ্গবিশেষের কোষের নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক জিন অধিকতর কর্মক্ষম থাকে। জীবের কোষে আসলে যত ডিএনএ রয়েছে, সে তুলনায় জিনের সংখ্যা বেশ কম। আর জীবে যত কোষ রয়েছে আর তাতে যত জিন রয়েছে হিসাব কষলে দেখা যাবে যে এর অনেক জিনই অপ্রকাশিত থেকে যায়। নির্দিষ্ট পরিবেশ প্রতিবেশ বা প্রণোদনা না পেলে কোনো কোনো জিন তার কাজ করা থেকে বিরত থাকে। কোনো জিনের প্রোডাক্টের চাহিদা তৈরি না হলে জিনই বা কাজ করবে কেন। জিনের কাজ তো আর কেবল জিনের ইচ্ছাধীন নয়। বরং জীবের নিজস্ব তাগিদের খবর জিনের কাছে পৌঁছালে তবে জিন কাজ করে।

সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীদের সমাপ্ত করা একটি পরীক্ষা থেকে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। শামুককে নিয়ে এ মজার পরীক্ষাটি পরিচালিত হয়। একটি কাঠের টেবিলের ওপর একটি শামুককে চলতে দেওয়া হলে শামুকটি ধীরে ধীরে এর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে চলতে থাকে। বিজ্ঞানী একটি কাঠি দিয়ে টেবিলের ওপর একটি শব্দ করেন। শামুকটি শব্দ শুনে চলা বন্ধ করে দেয়। কতক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন সে বুঝতে পারে যে বাইরে থেকে হয়তো আর কোনো শব্দ আসছে না, তখন সে আবার চলতে শুরু করে। আবারও টেবিলের ওপর কাঠি দিয়ে হালকাভাবে শব্দ করা হয়। এবারও সে থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকে। তবে এবার এর অপেক্ষা করার সময়টা আগের তুলনায় কম হয়। এভাবে কয়েকবার টেবিলের ওপর কাঠি দিয়ে আঘাত করার পর দেখা গেল যে সে আর শব্দ শুনলেও থামছে না। অব্যাহত গতিতে সে এগিয়েই যাচ্ছে। বিষয়টি বিজ্ঞানীদের খুব অবাক করল। তারা এবার শামুকের জিন নিয়ে

গবেষণা করে এ সত্যে উপনীত হতে পারলেন যে জীবে অনেক জিন আছে, যারা অপ্রকাশিত থেকে যায়। পরিবেশ–পরিস্থিতি বাধ্য করলে তখনই কেবল কোনো কোনো জিন প্রকাশ পায়। বারবার টেবিলে আঘাত করায় শামুকের কোনো কোনো জিন কার্যক্ষম ও কার্যকর হয়ে উঠেছে। ফলে তা নতুন নতুন প্রোটিন তথা এনজাইম তৈরি করতে সক্ষম হয়। এসব এনজাইম জীবকোষে ঘটায় নতুন নতুন বিক্রিয়া। তারই ফলে তৈরি হয় কোনো একটি উৎপাদ বা প্রোডাক্ট। এরই প্রভাবে শামুক হয়ে ওঠে ভয়শূন্য। বাইরের শব্দ তখন আর একে কাবু করতে পারে না।

আমাদের বাস্তব জীবন থেকেও এ ধরনের জিনের উদাহরণ তুলে ধরা যায়। দুধ পান করতে যারা অভ্যস্ত তাদের কোষে নিয়মিত তৈরি হয় 'লেকটেজ' নামক এনজাইমটি। ফলে এর উপস্থিতিতে দুধ সহজে পরিপাক হয়। নিয়মিত যে দুধ পান করে তার দেহে দুধ হজম করার জিনটি কর্মক্ষম থাকে। অনেক দিন দুধ না পান করলে এ জিনটি আবার অকার্যকর হয়ে পড়ে। তখন হঠাৎ করে দুধ পান করলে তখন বদহজম দেখা দেয়। কারণ ওই জিনটি দীর্ঘদিন প্রকাশিত না হওয়ার কারণে লেকটেজ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। দু–চার দিন দুধ খেতে থাকলে আবার জিনটি কার্যকর হয়ে ওঠে এবং নিয়মিত তখন লেকটেজ উৎপাদন ঘটতে থাকে। ফলে সহজেই দুধ হজম করা সম্ভবপর হয়। তার মানে দেহের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জিন বা জিনসমূহ কাজ করে।

সাধারণত জীবের বহু জিনই থেকে যায় অকার্যকর। বহু জিন জীব নানা রকম ঘাত–প্রতিঘাত বা পীড়নের সম্মুখীন হলে তবেই কেবল কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। এসব জিন নির্দিষ্ট ঘাত বা পীড়ন না পেলে অপ্রকাশিতই থেকে যায়। ধানের একটি চমৎকার উদাহরণ এখানে তুলে আনা যায়। ধান চাষ করার জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, এক কেজি ধান পাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় প্রায় ৪০০০ লিটার পানি। এত পানি পছন্দ করে বলেই ধানের জমিতে কৃষক চান সব সময় কিছু পানি ধরে রাখতে। কোনো কোনো অঞ্চলে ধানি মৌসুমে কখনো যদি ভীষণ খরা দেখা দেয় অথবা যদি পানি সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে বা সেচ ব্যবস্থা কোনো কারণে নষ্ট হয় তাহলে পানির অভাবে ধানগাছে জৈব রাসায়নিক ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে অনেক রকম পরিবর্তন আসে। পানির অভাব ঘটলে পানিহীনতা কোষের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তখন গাছের বৃদ্ধি ও বিকাশ শ্লথ হয়ে পড়ে বা একপর্যায়ে এসে তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। গাছ তখন এসব ক্ষতিকারক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার নানা রকম চেষ্টা যে করে কোষস্থ নানা রকম রাসায়নিক বস্তু বিশ্লেষণ এবং স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া ধানগাছের কোষের ভেতরকার রাসায়নিক বস্তুর তুলনা করে সেসব অনেক না জানা কথা জানা সম্ভব হয়েছে। গাছ যখন খরার মধ্যে পড়ে তখন তার কর্মহীন থাকা কোনো কোনো জিন সে অবস্থায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে কোষে তখন নানা রকম রাসায়নিক বস্তু তৈরি হয়। গাছ তার ক্ষতি যতটা পারে কমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এর মাধ্যমে। এখানে পানির লম্বা সময়ের ঘাটতি সুপ্ত জিনকে সক্রিয় করে তোলে। খরা এখানে কোনো কোনো জিনের প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে থাকে। খরা অবস্থায় যেসব রাসায়নিক বস্তু তৈরি হয়, এদের জন্য দায়ী জিনসমূহ তখন কার্যকর হয়ে ওঠে।

কিছু কিছু জিনের প্রকাশের জন্য প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট কিছু পরিবেশ। তাপমাত্রার প্রভাবে কোনো কোনো জিনের প্রকাশ কী রকম হতে পারে, তার একটি চমৎকার উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। বার্লিগাছের একটি পরিবর্তিত জিন এমন যে তাপমাত্রা যখন ৮° সেন্টিগ্রেডের নিচে থাকে তখন চারা গাছটির বর্ণ হয়

ধবল। আবার ওই জিনসম্পন্ন চারা গাছটি যখন ১৯° সে. বা তার বেশি তাপমাত্রায় জন্মানো হয় তখন এর পাতা হয় একেবারে স্বাভাবিক সবুজ। তাপমাত্রার প্রভাবে কখনো এর আংশিক প্রকাশ ঘটছে তো আবার তাপমাত্রার প্রভাবেই ঘটছে এর পূর্ণ প্রকাশ।

জিন সব সময় অপরিবর্তিত থাকে, তা কিন্তু নয়। নানা প্রাকৃতিক কারণেই জিনের গঠন পাল্টে যেতে পারে। জিনের গঠন পাল্টে গেলে কখনো কখনো জিন আর কাজই করতে পারে না। যদি জিনের নিয়ন্ত্রণকারী অঞ্চলের গঠনগত পরিবর্তন ঘটে তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যেতে পারে জিনের কাজই। তার মানে যে জিন আগে প্রোটিন তৈরি করতে পারত পরবর্তী সময়ে সে জিন আর কোনো প্রোটিনই তৈরি করতে পারছে না এদের প্রোমোটার বা জিনের নিয়ন্ত্রণকারী অঞ্চলে বড় রকম কোনো গঠনগত পরিবর্তন একে করে তুলতে পারে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন। বিশেষ করে জিনের নিয়ন্ত্রণকারী অঞ্চলে কোনো কোনো গঠনগত পরিবর্তনের কারণে হারাতে পারে জিনের কাজের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে। অনেক স্বাভাবিক জিন এ রকম পরিবর্তনের ফলে ক্যানসার সৃষ্টিকারী জিনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার প্রমাণ রয়েছে। এ রকম ক্ষেত্রে জিনের প্রোডাক্ট উৎপাদন চলে অবিরত। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতে চলে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন। তাতে অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যেতে পারে কোষসংখ্যা। এভাবে জীবদেহে সৃষ্টি হয়ে থাকে কোনো কোনো ক্যানসার।

কোনো কোনো স্বাভাবিক জিনের বিভিন্ন স্থানে গঠনগত ত্রুটি সৃষ্টি হওয়ায় জীবে নানা রকম রোগের কারণ হতে পারে। জিন মিউটেশনের কারণে মানুষে বহু রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। স্বাভাবিক জিন যে প্রোটিন তৈরি করে, তা স্বাভাবিক। পরিবর্তিত জিন যে প্রোটিন তৈরি করে, তা হতে পারে অস্বাভাবিক। সেটিই তৈরি করতে পারে রোগশোক এবং নানা রকম অস্বাভাবিকতা। তার মানে জিনের কাজ করার ক্ষমতা রহিত না হলেও প্রকৃত অর্থে স্বাভাবিক কাজ না করে তা করছে মানুষের জন্য অকাজই। সৃষ্টি করতে নানা রকম দৈহিক বা মানসিক কিংবা মনোদৈহিক সমস্যা।

বিজ্ঞানীরা বলছেন মানুষের যে অঙ্ক কষবার ক্ষমতা কিংবা গান গাইবার ক্ষমতা এগুলোও বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনীয় পরিবেশ আর পরিচর্যা পেলে এসব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং চর্চার মধ্য দিয়ে তা পরিণতি লাভ করে, পরিশীলিত হয়। কেবল জিনের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়। এর প্রকাশ উপযোগী পরিবেশ বড় জরুরি। আমাদের অনেকের মধ্যে কণ্ঠশিল্পী হয়ে উঠবার জন্য যে কণ্ঠ প্রয়োজন তা রয়েছে, কিন্তু বৈরী পরিবেশ ও চর্চাহীনতা কণ্ঠশিল্পী হয়ে ওঠা থেকে কাউকে কাউকে হয়তো বিরত রাখছে। অঙ্ক কষবার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জিনের মধ্যে থাকলেই চলবে না এর পরিস্ফুরণ ঘটাবার জন্য যে চর্চা প্রয়োজন, সেটি অব্যাহত থাকলেই কেবল অঙ্ক বিশারদ হওয়া সম্ভব। এমনি অনেক অপার সম্ভাবনার জিন লুকিয়ে আছে আমাদের দেহে কোষের মধ্যে আমাদের অলক্ষ্যে। উপযুক্ত পরিবেশ আর পরিচর্যা পেলে অপ্রকাশিত বহু জিন প্রকাশিত হতে পারে। কে জানে পরিবেশ আর চর্চার মধ্য দিয়ে নানা বিরল বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটলে এক একজন সাধারণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে এক একজন হিরণ্ময় মানুষ।

জীবনে একবারও কাজ করে না কিংবা করতে পারে না তেমন কিছু কিছু জিনও কিন্তু জীবের থাকে। জীব তার জীবনকালে কোনো কোনো জিনের কাজ করবার পরিবেশটি একবারও পায় না বলে তাদের আর কাজ করা হয়ে ওঠে না। তার মানে জীবের আজীবন নিষ্ক্রিয় থেকে যায় তেমন জিনও থাকে বেশ কিছু। এ রকম

আজীবন অপ্রকাশিত কোনো কোনো জিন প্রকাশিত হলে জীবের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেত কি না, তা আজ আমাদের জানা নেই। আবার অপ্রকাশিত কোনো কোনো জিন প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা কোনো সমস্যার হাত থেকে বেঁচে গেছি না, তা–ও রয়ে গেছে অজানা।

অপ্রকাশিত জিন নিয়ে এখন কৃষিবিজ্ঞানীরা বড় বেশি আশাবাদ ব্যক্ত করছেন। তাঁদের মতে, ফসলের বহু অপ্রকাশিত জিন রয়েছে যাদের মধ্য থেকে কোনো কোনো কাঙ্ক্ষিত জিনের প্রকাশ ঘটাতে পারলে বেড়ে যেতে পারে ফসলের ফলন। কেউ কেউ মনে করছেন, কোনো কোনো অকার্যকর থাকা জিনের প্রকাশ ঘটাতে পারলে বাড়তে পারে উৎপাদিত পণ্যের গুণমানও। এ রকমটি করতে হলে বিজ্ঞানীদের ব্যাপক গবেষণা চালাতে হবে নির্দিষ্ট ফসল নিয়ে। প্রয়োজন হবে জেনোম সিকোয়েন্সিং করে জিনের অবস্থান এবং এদের কোনটির কী কাজ, সেটি জানা। অতঃপর কোন কোন জিন নিষ্ক্রিয় থাকছে এবং কেন এদের নিষ্ক্রিয়তা, তা–ও জানতে হবে। এরপর আসবে নির্দিষ্ট নিষ্ক্রিয় জিনের কাজ কীভাবে সম্পন্ন করা যায় এর উপায় খোঁজা। কাজগুলো খুব সহজ নয়, সেটা সহজেই অনুমেয়। অনেক গবেষণা, অর্থ আর সময় এর পেছনে ব্যয় করতে হবে। প্রয়োজন হলে মানুষ তবু যে তা করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো নিষ্ক্রিয় জিনের কাজকে প্রকাশ করার উপযুক্ত পরিবেশ দিতে পারলে তা যদি আমাদের কোনো ফসলে বা গৃহপালিত পশুতে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারে, তবে তা করার নিশ্চয়ই চেষ্টা করতে হবে। মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্যই সেটি করতে হবে।

প্রবন্ধকার : প্রফেসর, কৌলতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।

মাশরুম ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আশীর্বাদ

হোসনে আরা পারভীন

মাশরুম কী : মাশরুম হচ্ছে একধরনের অপুষ্পক উদ্ভিদ। এগুলো মূলত ব্যাঙের ছাতার মতো দেখতে Basidiomycetes অথবা Ascomycetes শ্রেণির অন্তর্গত মৃতজীবী ছত্রাক। ছত্রাকবিদদের মতে, মাশরুম থেকেই 'মাইকোলজি' শব্দটি এসেছে। এদের দেহে সবুজ কণা Chlorophyll নেই বিধায় সবুজ উদ্ভিদের মতো নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করতে পারে না। সে কারণে খাদ্যের জন্য এরা প্রাণিজ বা উদ্ভিজ্জ বস্তুর ওপর নির্ভরশীল।

বিভিন্ন প্রকার মাশরুম

ব্যাঙের ছাতা ও মাশরুম দেখতে একই রকম হলেও এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। ছত্রাকবিদরা বিশ্বে প্রায় ৩ লাখ প্রজাতির ছত্রাক চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এই অসংখ্য ছত্রাকের মধ্য থেকে দীর্ঘ যাচাই ও বাছাই করে যেসব ছত্রাক সম্পূর্ণ খাওয়ার উপযোগী, পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সেগুলোকেই তাঁরা মাশরুম হিসেবে গণ্য করেছেন। সুতরাং ব্যাঙের ছাতা এবং মাশরুম এক জিনিস নয়। ব্যাঙের ছাতা মাশরুমের মতো দেখতে বন-জঙ্গলে প্রাকৃতিকভাবে যত্রতত্র ছাতা আকৃতি নিয়ে জন্মানো ছত্রাক, যেগুলো খাওয়ার অনুপযোগী ও বিষাক্ত। কিন্তু মাশরুম হলো বিশ্বের সর্বাধুনিক পদ্ধতির (টিস্যু কালচার) মাধ্যমে উৎপন্ন বীজ দ্বারা সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করা সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং ঔষধিগুণসম্পন্ন সবজি, যা সম্পূর্ণ হালাল।

মাশরুম সবজি হিসেবে একটি পুষ্টিকর খাদ্য। শুধু খাওয়ার উপযোগী ব্যাঙের ছাতা মাশরুম অর্থাৎ সকল মাশরুমই ব্যাঙের ছাতা কিন্তু সকল ব্যাঙের ছাতা মাশরুম নয়। বিশ্বব্যাপী ভোজনরসিকরা মাশরুমকে স্বর্গীয় খাবারের সাথে তুলনা করে। হাদিস শরিফে মাশরুমকে বেহেশতি খাবারের সাথে তুলনা করা হয়েছে (সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফ)। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে মাশরুমকে অত্যন্ত মর্যাদাকর খাবার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সহিহ বুখারি শরিফে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আল কামাতু মিনাল মান্না ওয়া মাহা সাফা আল আইন' অর্থাৎ মাশরুম এক শ্রেণির মান্না এবং এর রস চোখের জন্য ওষুধ বিশেষ। আর মান্না সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারার ৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে– 'আর আমি মেঘমালা দিয়ে তোমাদের ওপর ছায়া দান করেছি এবং তোমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানিত খাবার পাঠিয়েছি মান্না ও

সালওয়া। তোমরা খাও সেসব পবিত্র বস্তু, যা আমি তোমাদের জন্য দান করেছি।'

মাশরুমের স্বাদ ও পুষ্টি দুটোই অসাধারণ হওয়ায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ সাল থেকে মানুষ মাশরুমকে সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আসছে। প্রাচীন ফারাও সম্রাট মাশরুমকে দেবতার খাবার হিসেবে মনে করতেন। রোমানরা একে ঈশ্বরের খাবার আর গ্রিকরা মনে করতেন ঝুঁকিপূর্ণ লড়াইয়ের ময়দানে জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শৌর্যবীর্য জোগাতে পারে মাশরুম। তাই একে যোদ্ধাদের শক্তিবর্ধক খাবার হিসেবে গণ্য করতেন। চীনারা অমরত্বের সন্ধানে মাশরুম খাওয়া শুরু করেন এবং একে দীর্ঘজীবী হওয়ার খাদ্য হিসেবে বিশ্বাস করেন। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ মুখরোচক মাশরুমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খাদ্যতালিকায় অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। এমনকি রাষ্ট্রীয় অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যবহৃত হতো অসাধারণ লোভনীয় স্বাদের মাশরুম। মাশরুম শুধু নিজেই স্বাদের খাবার নয়, এটা অন্য খাবারের সাথে ব্যবহার করলে তার স্বাদ বহুগুণে বেড়ে যায়। তাই মাশরুমকে বলা হলো পরমস্বাদু খাবার।

ব্যাঙের ছাতা ও মাশরুমের আবাসস্থল : হিউমাসসমৃদ্ধ ছায়াযুক্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে মাশরুম ও ব্যাঙের ছাতা জন্মাতে দেখা যায়। বর্ষাকালে পচা কাঠ, পচা খড়ের গাদা, বাঁশঝাড়, গোবর ও অনাবাদি জমিতে এরা একক বা দলবদ্ধভাবে জন্মে। অনেক সময় কোনো বিস্তীর্ণ স্থানে বহু মাশরুমকে বৃত্তাকারে অবস্থান করতে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থাকে পরীচক্র বা Fairy Ring বলা হয়। কারণ প্রাচীনকালে মনে করা হতো যে, বৃত্তাকার বা চক্রাকারে জন্মানো ব্যাঙের ছাতাগুলো নৃত্যরত পরীদের যাতায়াত পথ। সূর্যের আলোয় প্রাকৃতিকভাবে খুব বেশি মাশরুম জন্মাতে পারে না, তাই প্রাকৃতিক উপায়ে খাবারের জন্য বেশি মাশরুম পাওয়া যায় না।

পরীচক্র বা Fairy Ring চাষ করা মাশরুম

***Agaricus* বা মাশরুমের দৈহিক গঠন :** আমরা ছাতার মতো মাশরুমের যে অংশটি দেখতে পাই, এটিকে ছত্রাকের ফ্রুট বডি (fruit body) বলা হয়। মাশরুমের ফ্রুট বডি বা ভক্ষণযোগ্য অংশটিকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। পিলিয়াস (Pilius)

২। গিল (gills) বা ল্যামেলা (lamellae)

৩। আবরণ বা ভেইল অ্যানুলাস (veil annulus)

৪। দণ্ড বা স্টাইপ (stipe)

চিত্র : *Agaricus* বা মাশরুমের বিভিন্ন অংশ

১. পিলিয়াস (Pilius) : পিলিয়াস অনেকটা ছাতার আকৃতির মতো। এটি সাধারণত মাংসল (fleshy) এবং পুরু হয়। জাতভেদে পিলিয়াস বিভিন্ন আকৃতি, মাপ ও বর্ণের হয়।

২. গিল (gills) বা ল্যামেলা (lamellae) : ল্যামেলা মাশরুমের পিলিয়াস নিচের অংশ। এর মধ্যে বংশবিস্তারের অতি প্রয়োজনীয় স্পোর (spore) থাকে। জাতভেদে স্পোরের রং বিভিন্ন হয় এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে রঙের পরিবর্তন হয়। গিল একধরনের অসংখ্য সমান্তরাল সুতো দিয়ে তৈরি এবং এরই মধ্যে গদাকৃতির কোষের শীর্ষে বেসিডিওস্পোর থাকে। স্পোরগুলো খালি চোখে দেখা যায় না, তবে অনেকগুলো স্পোরকে একত্রে ধুলোর মতো মনে হয়। এগুলো বাতাসের সাহায্যে বিস্তৃত হয়। অনুকূল পরিবেশে স্পোরগুলো গজিয়ে সুতোর মতো এক ধরনের অঙ্গ গঠন করে, এগুলোকে হাইফা (hypha) বলা হয়। অনেকগুলো হাইফাকে একত্রে মাইসেলিয়াম বলে। মাইসেলিয়াম বৃদ্ধি পেয়ে দীর্ঘায়িত হয় এবং খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে। হাইফাই ছত্রাকের মূল কাঠামো।

৩. আবরণ বা ভেইল অ্যানুলাস (veil annulus) : মাশরুমের সদ্যোজাত ফ্রুট বডির গিল (gills) এক ধরনের কোষকলা দিয়ে আবৃত থাকে, যা পিলিয়াস প্রান্ত থেকে দণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কোষকলাকে আবরণ বলা হয়। ধীরে ধীরে ফ্রুট বডির বৃদ্ধি হতে থাকলে পিলিয়াসের আবরণ ছিঁড়ে যায় এবং এর কিছু অংশ প্রান্তভাগ সংলগ্ন থাকে অন্য অংশ দণ্ডের (stipe) চারিদিকে আংটির মতো থাকে। এটিকে অ্যানুলাস বলা হয়।

৪. দণ্ড (stipe or stalk) : পিলিয়াসকে এই দণ্ডই (stipe) ধারণ করে রাখে। এই দণ্ডটি সাধারণভাবে

পিলিয়াসের মাঝামাঝি থাকে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এটি এক পাশেও থাকতে পারে। দণ্ডটির ভেতরের অংশ ভরাট কিংবা ফাঁপা থাকতে পারে। দণ্ডটির সর্বাংশ একই ধরনের পরিধিবিশিষ্ট হতে পারে কিংবা মধ্যম বা শেষ প্রান্ত কিছুটা ফুলে থাকতে পারে।

মাশরুমের পুষ্টিমান : পুষ্টি বিচারে মাশরুম নিঃসন্দেহে সবার সেরা। কারণ আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় যেসব উপাদান অতি প্রয়োজনীয় যেমন–প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল, সেগুলো মাশরুমে উঁচু মাত্রায় আছে। অন্যদিকে যেসব খাদ্য উপাদানের আধিক্য আমাদের জটিল মরণব্যাধির দিকে নিয়ে যায়, যেমন–ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট তা মাশরুমে নেই বললেই চলে। প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনা মাশরুমে নিম্নলিখিত পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়।

মাশরুমের পুষ্টিমূল্য (১০০ গ্রাম শুকনা মাশরুম)

আমিষ-২৫-৩৫ গ্রাম, ভিটামিন ও মিনারেল ৫৭-৬০ গ্রাম, শর্করা ৫-৬ গ্রাম, চর্বি ৪-৬ গ্রাম (অসম্পৃক্ত চর্বি)

প্রোটিন

মাশরুমের প্রোটিন হলো অত্যন্ত উন্নত, সম্পূর্ণ এবং উপকারী। একটি সম্পূর্ণ প্রোটিনের পূর্বশর্ত হলো মানবদেহের অত্যাবশ্যকীয় ৯টি অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপস্থিতি। মাশরুমে অপরিহার্য এ ৯টি অ্যামাইনো অ্যাসিডই প্রশংসনীয় মাত্রায় আছে। অন্যান্য প্রাণিজ আমিষ যেমন–মাছ, মাংস, ডিমের আমিষ উন্নত মানের হলেও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত চর্বি থাকায় তা গ্রহণে দেহে কোলেস্টেরল সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, মেদভুঁড়ি ইত্যাদি জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে মাশরুমের প্রোটিনে ক্ষতিকর উপাদান নেই। তাছাড়া প্রোটিনের বিপরীতে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটের সর্বনিম্ন উপস্থিতি এবং কোলেস্টেরল ভাঙার উপাদান লোভাস্টাটিন, এন্টাডেনিন, ইরিটাডেনিন ও নায়াসিন থাকায় কোলেস্টেরল জমার ভয় থাকে না। এ কারণে প্রোটিনের অন্যান্য সব উৎসের তুলনায় মাশরুমের প্রোটিন সর্বোৎকৃষ্ট ও হিতকর। মাংসে প্রোটিন আছে ২২-২৫ গ্রাম, মাশরুমে প্রোটিন আছে ২৫-৩৫ গ্রাম।

ফ্যাট

মাশরুমের ফ্যাট অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড দ্বারা তৈরি, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এছাড়া স্ফিঙ্গলিপিড ও আরগেস্টেরল থাকায় এর মানকে আরও উন্নত করেছে। স্ফিঙ্গলিপিড থাকায় হাড়ের মজ্জা ও ব্রেন ডেভেলপমেন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং আরগেস্টেরলের উপস্থিতির কারণে ভিটামিন-ডি সিনথেসিসে সহায়ক হয়, যা হাড় ও দাঁত তৈরি এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে। এছাড়া মাশরুমের ফ্যাটে ৭০-৮০% লিনোলিক অ্যাসিড আছে, যা শরীর সুস্থ রাখতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে।

কার্বোহাইড্রেট

মাশরুমের মধ্যে অধিকাংশ পলিস্যাকারাইড যেমন– গ্লাইকোজেন, বেটা-ডি-গ্লুক্যান, ল্যাম্পট্রোল, লেন্টাস্টাটিন, এন্টাডেনিন, ইরিটাডেনিন, ট্রাইটারপিন, এডিনোসিন, ইলুডিন প্রভৃতি থাকায় দেহের জটিল রোগ নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া মাশরুম অ্যাসিডিক সুগার ও অ্যাসিডিক পলিস্যাকারাইড বিশেষ করে H51 সরবরাহ করে। মাশরুমে আঁশের পরিমাণও বেশি। জাতভেদে ১০-২৮% আঁশ পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কার্বোহাইড্রেট গ্রহণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, যা সম্পূর্ণ খরচ না হয়ে শরীরে জমা হয় এবং নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করে। মাশরুমে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম এবং তা পানিতে দ্রবণীয়। ফলে মাশরুমের কার্বোহাইড্রেট শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এটি ডায়াবেটিস রোগীদের শরীরে গ্লুকোজ জমে যাওয়ার আশঙ্কা দূর করে এবং ইনসুলিনের চাহিদা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায় ব্যাঙের ছাতার মাশরুম ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আশীর্বাদ'।

ভিটামিন ও মিনারেল : ভিটামিন ও মিনারেল দেহে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। প্রতিদিন চাহিদামাফিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিটামিন ও মিনারেল গ্রহণ না করলে দেহে বিভিন্ন জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। অল্প পরিমাণে অথচ অত্যাবশ্যকীয় এ খাদ্য উপাদান গ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে এ অবস্থার সৃষ্টিই হবে না। ভিটামিন ও মিনারেলের উৎস হিসেবে মাশরুমের অবস্থান খুবই উচ্চ। শুকনা মাশরুমে ৫৭%-৬০% ভিটামিন ও মিনারেল (অত্যাবশ্যকীয় ট্রেস এলিমেন্টসহ) বিদ্যমান। পটাশিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৭০ ভাগ, যার মধ্যে আবার ৪৫ ভাগই হচ্ছে পটাশিয়াম। এছাড়া কপার ও সেলিনিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় চুল পড়া, চুল পাকা রোধসহ নারীদের ব্রেস্ট ক্যানসার প্রতিরোধ করে।

১। মাশরুমে আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন ও মিনারেল এমন সমন্বিতভাবে আছে, যা শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে গর্ভবতী মা ও শিশু নিয়মিত মাশরুম খেলে দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২। এতে চর্বি ও শর্করা কম থাকায় এবং আঁশ বেশি থাকায় রক্তে চিনির সমতা রক্ষা করে। ফলে ডায়াবেটিস রোগীদের আদর্শ খাবার হিসেবে গণ্য করা হয়। যারা স্থূল বা মোটা তাদের জন্যও উপযুক্ত খাবার।

৩। রক্তের কোলেস্টেরল কমানোর অন্যতম উপাদান ইরিটাডেনিন, লোবাস্টটিন ও এনটাডেনিন মাশরুমে থাকায় এটি হৃদ্‌রোগ ও উচ্চ রক্তচাপ নিরাময় করে।

৪। মাশরুমে প্রচুর ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-ডি থাকায় শিশুদের হাড় ও দাঁত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৫। প্রচুর ফলিক অ্যাসিড ও আয়রনসমৃদ্ধ বিধায় মাশরুম রক্তশূন্যতা দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

৬। এতে লিংকেজাই-৮ নামক পদার্থ থাকায় হেপাটাইটিস-বি জন্তিস প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।

৭। মাশরুমের বেটা-ভি, গ্লুকেন, ল্যাম্পট্রোল, টারপিনওয়েড এবং বেনজোপাইরিন ক্যানসার ও টিউমার প্রতিরোধক।

৮। মাশরুমের ট্রাইটারপিন এইডস প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৯। মাশরুমের এডিনোসিন ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধক। কান মাশরুম (Auricularia spp.) চোখ ও গলা ফোলায় উপকারী।

১০। ইলুডিন এম ও এস থাকায় এটা আমাশয়-প্রতিরোধী ও বিভিন্ন প্রকার এনজাইমসমৃদ্ধ মাশরুম আমাদের পেটের পীড়ায় উপকারী।

১১। মাশরুমে সালফার সরবরাহকারী অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকায় তা চুল পড়া ও চুল পাকা প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

মাশরুমের গুরুত্ব : একজন সুস্থ লোকের জন্য প্রতিদিন ২০০-২৫০ গ্রাম সবজি খাওয়া উচিত। উন্নত দেশের মানুষেরা প্রতিদিন গড়ে ৪০০-৫০০ গ্রাম সবজি খায়। বিশ্বব্যাপী সবজি গ্রহণের তথ্য-উপাত্ত থেকে বোঝা যায়, যে দেশ যত বেশি উন্নত সে দেশে তত বেশি সবজি খাওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বিশ্বে মাশরুম খাওয়া ও উৎপাদনের ধারা হচ্ছে-বর্তমানে প্রায় ১০০টি দেশে মাশরুম চাষ হয়, যার ৭০% উৎপাদিত হয় চীনে। উৎপাদিত মাশরুমের ৮৫% ব্যবহৃত হয় গ্রুপ-৬ ভুক্ত ৬টি দেশে যথা – যুক্তরাষ্ট্র ৩০%, জার্মানি ১৭%, যুক্তরাজ্য ১১%, ফ্রান্স ১১%, ইতালি ১০%, কানাডায় ৬%। বাকি ১৫% মাশরুম খায় অবশিষ্ট বিশ্বের মানুষ। মাশরুমের পুষ্টি ও ঔষধি গুণের কারণে এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষের কাছে মাশরুম একটি জনপ্রিয় খাবার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ মাছ ও মাংসের তুলনায় বেশি এবং প্রচলিত সবজির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। মাশরুমে আমিষের পরিমাণ আলু থেকে দ্বিগুণ, টমেটো থেকে চার গুণ এবং কমলালেবুর থেকে ছয় গুণ বেশি।

সবজিতে পাওয়া যায় দেহকে সুস্থ, সবল রোগমুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য উপাদান ও রোগ প্রতিরোধক ভিটামিন ও মিনারেল। অধিক সবজি খাওয়ার ফলে তারা অধিক কর্মক্ষম থাকেন এবং বেশি আয়ু লাভ করেন। অথচ আমরা প্রতিদিন গড়ে ৪০-৫০ গ্রাম (আলু বাদে) সবজি খাচ্ছি। প্রয়োজন ও প্রাপ্তির এই ব্যবধানের কারণে আমাদের দেশের শতকরা ৮৭% লোক অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগেন। এ অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে পুষ্টিকর সবজি খাওয়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে, আর অধিক পরিমাণে সবজি খেতে হলে অধিক পরিমাণ সবজি উৎপাদন করতে হবে। আমরা জানি, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচলিত ২টি পদ্ধতি, একটি হলো আবাদি জমি বাড়িয়ে- সমান্তরাল পদ্ধতি (Horizontal Method) এবং অপরটি হলো প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে- উল্লম্বিক পদ্ধতি (Vertical Method)। আমাদের দেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক সমহারে সবজি উৎপাদনের উপযোগী জায়গা কমে যাচ্ছে। এক হিসাব মতে, দেখা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমি কমে যাচ্ছে। এরই ফলে বর্তমানে দেশের ভূমিহীনের সংখ্যা প্রায় ৫০ ভাগের মতো, যাদের শুধু ঘরটিই একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ সমান্তরাল পদ্ধতি এ দেশের জন্য অচল। তাহলে

শুধু উল্লম্বিক পদ্ধতিই আমাদের সমস্যার সমাধান দিতে পারে। কিন্তু এ পদ্ধতির জন্যও ন্যূনতম আবাদি জমির দরকার হয়। অথচ দেশের ৫০% লোকের সে সুবিধাও নেই। তাই আমাদের এখন এমন কোনো সবজি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার, যা চাষিরা তাদের ঘরকে ব্যবহার করে উৎপাদন করতে পারেন, আর তা কেবল মাশরুম চাষের মাধ্যমেই সম্ভব।

মাশরুম চাষের সাধারণ সুবিধাসমূহ

(১) মাশরুম চাষে আবাদি জমির দরকার হয় না, তাকে তাকে সাজিয়ে একটি ঘরেই প্রচুর মাশরুম চাষ করা যায়।

(২) কম পুঁজি দিয়ে ঘরের মধ্যে চাষ করে বিনিয়োগকৃত অর্থ অল্প সময়ের মধ্যে তুলে আনা সম্ভব হয়।

(৩) অত্যন্ত অল্প সময়ে অর্থাৎ মাত্র ৭-১০ দিনের মধ্যে ফলন পাওয়া যায়, যা বিশ্বের অন্য কোনো ফসলে সম্ভব নয়।

(৪) অল্প শ্রমের মাধ্যমে বাড়ির যে কেউ মাশরুম চাষে অংশ নিতে পারে। সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণে কর্মহীন লোকদের নিয়োজিত করে জনগণকে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

(৫) মাশরুম চাষের মাধ্যমে এ দেশের পুষ্টি উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা বেকারত্ব দূরীকরণ (বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি), আমদানি ব্যয় হ্রাস এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ উন্নয়নের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

পৃথিবীতে ৩ লাখ প্রজাতির ছত্রাক থাকলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ২০০ প্রজাতির খাওয়ার উপযোগী ছত্রাক তথা মাশরুমের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩০টি প্রজাতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এবং ১০টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে চাষ করা সম্ভব। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু মাশরুম চাষের অত্যন্ত উপযোগী। সেই সাথে চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণও (যেমন– খড়, কাঠের গুড়া, আখের ছোবড়াসহ বিভিন্ন কৃষিজ ও শিল্পজ বর্জ্য) অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য। আমাদের দেশে সাধারণত খাবারের উপযোগী তিন জাতের মাশরুম চাষ হয়।

১। স্ট্র মাশরুম : ধানের খড়, শিমুল তুলা, ছোলার বেসন ও চাউলের কুঁড়া ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে স্ট্র মাশরুম চাষ করা হয়। আমাদের দেশে সাধারণত মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এর চাষ করা যায়।

২। ইয়ার মাশরুম : সাধারণত বর্ষাকালে প্রাকৃতিকভাবে আমগাছে ইয়ার মাশরুম পাওয়া যায়। এরা দেখতে কালচে রঙের। ইয়ার মাশরুম সারা বছর চাষ করা গেলেও সাধারণত বর্ষাকালে এর ফলন ভালো হয়।

৩। অয়েস্টার মাশরুম : আমাদের দেশে এই জাতের মাশরুম চাষ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। সারা বছরই এই মাশরুম চাষ করা যায়, তবে শীত ও বর্ষাকালে এর ফলন ভালো হয়। অয়েস্টার মাশরুম খুব সহজে চাষ করা যায় এবং এর জন্য খুব অল্প জায়গার প্রয়োজন হয়।

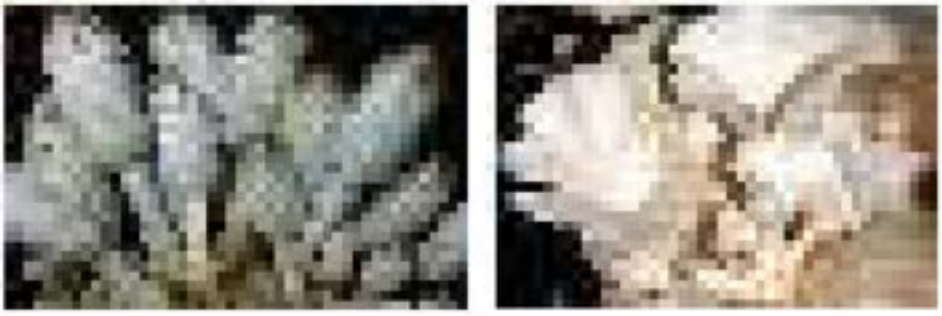

বিভিন্ন ধরনের মাশরুম

মাশরুম উৎপাদন কৌশল : মাশরুম খোলা জায়গায় চাষ করা যায় না। তাই এর জন্য আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না। মাশরুম চাষ করার জন্য ছায়াযুক্ত জায়গায় ছন বা বাঁশের চালা দিয়ে ঘর তৈরি করতে হয়। মাটির দেয়াল দিয়েও ঘর তৈরি করা যায়। আবার বাঁশের বেড়াও দেওয়া যায়। ঘরের ভেতর যাতে আলো ঢুকতে না পারে, সেজন্য বাঁশের বেড়ায় মাটি লেপে দিতে হয়।

অয়েস্টার মাশরুম চাষ পদ্ধতি : অয়েস্টার মাশরুম বীজ বা স্পন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগাড় করে ধাপে ধাপে মাশরুম চাষ করতে হয়।

প্রথম পদ্ধতি

১। মাশরুম চাষকেন্দ্র থেকে মাশরুমের বীজ বা স্পন প্যাকেট সংগ্রহ করতে হবে। বীজ বা স্পনের দুই পাশে কিছুটা গোল করে কেটে চেঁছে নিতে হবে।

২। মাশরুমের প্যাকেট পানিতে ৩০ মিনিটের জন্য ডুবিয়ে রাখতে হবে। ৩০ মিনিট পরে পানি থেকে মাশরুমের প্যাকেট উঠিয়ে নিতে হবে।

৩। অতিরিক্ত পানি ঝরানোর জন্য মাশরুমের প্যাকেট ৫ থেকে ১০ মিনিট উপুড় করে রাখতে হবে। পানি ঝরে গেলে ঘরের নির্ধারিত জায়গায় রেখে দিতে হবে। প্রতিদিন এর ওপর তিন থেকে চারবার করে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

৪। সাধারণত ৩ থেকে ৪ দিন পর কাটা জায়গা থেকে অঙ্কুর গজায়। অঙ্কুর গজানোর পর মাঝে মাঝে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

৫। খাওয়ার উপযোগী মাশরুম উৎপন্ন হতে ৫ বা ৬ দিন সময় লাগে।

৬। বীজের যে জায়গা কাটা হয়েছিল, তা ব্লেড দিয়ে একটু চেঁছে দিতে হবে। এই বীজ থেকে আবার মাশরুম গজাবে।

৭। একটা আধা কেজি ওজনের বীজ বা স্পন প্যাকেট থেকে ৩-৪ বার মাশরুম পাওয়া যায়। এতে মোট ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম মাশরুম পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

১। মাশরুম চাষকেন্দ্র থেকে বীজ বা স্পন সংগ্রহ করতে হবে। এক কেজি ওজনের একটি বীজের পলিথিন খুলে ভেতরের কম্পোস্ট গুঁড়ো করে নিতে হবে।

২। দুই কেজি পরিমাণ ধানের পরিষ্কার ও শুকনো খড় সংগ্রহ করতে হবে। খড়গুলোকে এক ইঞ্চি মাপে কেটে টুকরা করতে হবে।

৩। পরিমাণমতো পানি ফুটিয়ে নিতে হবে। খড়গুলো জীবাণুমুক্ত করার জন্য ফুটন্ত পানিতে খড়ের টুকরোগুলো এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।

৪। খড়গুলো পানি থেকে তুলে চিপে পানিশূন্য করে একটি পাত্রে রাখতে হবে।

৫। পাঁচটি পলিব্যাগ নিয়ে পলিব্যাগের ভেতরে প্রথমে কিছু খড় বিছিয়ে নিতে হবে। খড়ের ওপর মাশরুম বীজের গুঁড়ো দিতে হবে। এভাবে একটি পলিব্যাগে চার স্তরে খড় আর মাশরুম বীজের গুঁড়ো বিছিয়ে দিতে হবে। শেষ স্তরে আবার খড় বিছিয়ে দিতে হবে।

৬। খড় বিছানো শেষ হলে খুব শক্ত করে পলিব্যাগ বাঁধতে হবে। এভাবে প্রতিটি পলিব্যাগ বাঁধতে হবে।

৭। পলিব্যাগের চার দিকে ১০-১২টি ছিদ্র করতে হবে। এরপর ব্যাগগুলোকে বীজে পরিণত হওয়ার জন্য ১৫-১৮ দিন রেখে দিতে হবে।

৮। ১৫-১৮ দিন পরে পলিব্যাগগুলো খুলে বীজের দলাগুলো বের করে নিতে হবে।

৯। প্রতিটি বীজের দলা শিকায় করে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং প্রতিদিন ৪-৫ বার করে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

১০। ৩-৪ দিন পর চারদিক দিয়ে মাশরুমের অঙ্কুর গজাতে শুরু করবে। ৪-৬ দিন পর খাওয়ার উপযোগী মাশরুম গোড়া থেকে তুলে নিতে হবে।

১১। এভাবে মাশরুম চাষে লাভ বেশি হবে। কারণ প্রতিটি পলিব্যাগ থেকে প্রায় আধা কেজি মাশরুম পাওয়া যাবে। সুতরাং পাঁচটি ব্যাগ থেকে প্রায় আড়াই কেজি মাশরুম উৎপন্ন হবে।

সতর্কতা : মাশরুম একটি স্পর্শকাতর সবজি। পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নভাবে চাষ করলে মাশরুমের সাধারণত কোনো রোগবালাই কিংবা পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তবে পরিচর্যার অভাব বা অপরিচ্ছন্ন হলে কখনও কখনও বিভিন্ন ধরনের পোকা যেমন– (১) মাছি (স্ক্যারিড, ফোরিড, সিসিড ও লেপটোসেরা) (২) মাইট, (৩) উইভিল, (৪) স্প্রিং টেইলস (৫) পিঁপড়া, (৬) তেলাপোকা, (৭) ইঁদুর ইত্যাদি মাশরুমের ক্ষতি করতে পারে, এইজন্য সঠিক বালাই ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া মাশরুমের কিছু প্রজাতি রয়েছে, যা খুবই বিষাক্ত। এই ধরনের মাশরুম খেলে মানুষ ও প্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

বিষাক্ত মাশরুম চেনার উপায়

১। উজ্জ্বল বর্ণের প্রজাতিগুলো বিষাক্ত হয়ে থাকে।

২। এরা ঝাঁঝালো ও অম্লগন্ধযুক্ত হয়।

৩। এদের স্টাইপ বেশ শক্ত ও সহজে ভাঙে না। এরা সাধারণত কাঠের ওপর জন্মে।

৪। বিষাক্ত প্রজাতিগুলোর ব্যাসিডিওস্পোর বেগুনি বর্ণের।

৫। প্রখর রোদ সহ্য করতে পারে না বিধায় এদের রৌদ্রালোকিত স্থানে দেখা যায় না।

বিভিন্ন বর্ণের বিষাক্ত ছত্রাক

সঠিকভাবে মাশরুম চাষের মাধ্যমে এ দেশের পুষ্টি উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা বেকারত্ব দূরীকরণ (বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি), আমদানি ব্যয় হ্রাস এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ উন্নয়নের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান, জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র, হাসান বুক হাউজ, ঢাকা।

গাজী আজমল, সফিউর রহমান, গাজী পাবলিশার্স,৩৭, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ড. রবীন্দ্রনারায়ণ পাল, স্নাতক উদ্ভিদবিদ্যা, পাবলিশিং সিন্ডিকেট ৪৪-এ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

ছবি এবং কিছু তথ্য ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত।

প্রবন্ধকার : প্রভাষক, জীববিজ্ঞান, ধরমপুর মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

জর্জ কার্ভার : মাটি ও স্বজাতির প্রতি অন্তপ্রাণ এক বিজ্ঞানী

ড. আমানুল ইসলাম

আমাদের কাছে বিজ্ঞানী জর্জ কার্ভার নামটি তেমন পরিচিত নয়। তিনি ছিলেন একাধারে অগ্রণী কৃষিবিদ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, রসায়নের দিকপাল ও উদ্ভাবক। আবার ছিলেন চিত্রকর, গায়ক ও পিয়ানোবাদক। আলবার্ট আইনস্টাইন কার্ভারকে তাঁর সময়ের সেরা দশ বিজ্ঞানীর একজন বিবেচনা করতেন।

জর্জ কার্ভারের জীবন অনুপ্রেরণামূলক। দরিদ্র ও ক্রীতদাস পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কখনো হাল ছেড়ে দেননি। তাই হতে পেরেছিলেন কীর্তিমান বরণীয় এক বিজ্ঞানী। শৈশব থেকেই কার্ভার জীবন নির্বাহের জন্য রাঁধুনি, ধোপার কাজ করেছেন। তীব্র বর্ণবৈষম্য, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা মোকাবেলা করে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের একজন হয়েছিলেন। নিচুতলার মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে নিয়ে যেতে কাজ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন অন্য কালো ভাইদের সামনে। দেখিয়েছেন একজন সাদা মানুষ যা পারে, তা একজন কালো মানুষও পারে।

ক্রীতদাসপুত্র

বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ ও বিশ্বমানের শিক্ষাব্রতী হওয়ার আগে জর্জ কার্ভার ছিলেন এক ক্রীতদাস। জন্মগ্রহণ করেন এক দাসের ঘরে। তাই তাঁর সঠিক জন্মতারিখের কোনো নথি খুঁজে পাওয়া যায়নি। মনে করা হয় ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে তাঁর জন্ম। যে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন, তারা ১২ জুলাই ১৮৬৪ সালকে কার্ভারের জন্মতারিখ মনে করে। কার্ভারের মায়ের নাম ছিল মেরি। আর মনিব ছিলেন মজেস কার্ভার। শিশু অবস্থায়ই কার্ভারকে তাঁর মায়ের সাথে অপহরণ করা হয়। পরে অবশ্য খুঁজে বের করে তাকে মালিকের খামারে ফিরিয়ে আনা হয়। নিজের সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, 'আনুমানিক ১৮৬৪ সালে মানটনা অঙ্গরাজ্যের ডায়ামন্ড গ্রোভের কাছে এক খামারে ক্রীতদাস বাবা-মায়ের সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ; আমার শৈশবেই বাবা মারা যান আর মায়ের সাথে আমাকেও ডাকাতরা লুট করে নিয়ে যায় আরকানসাস অঙ্গরাজ্যে; তারপরে আর মায়ের দেখা পাইনি।'

পড়াশোনা

কার্ভার আরকানসাস অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিসে এক উচ্চবিদ্যালয় থেকে হাইস্কুল ডিপ্লোমা অর্জন করেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় আগ্রহী কার্ভার ১৮৮৮ সালে আইওয়ার সিম্পসন কলেজে পিয়ানো ও আর্টস বিষয়ে ভর্তি হন। কার্ভারের কৃষি প্রতিভায় মুগ্ধ আর্ট ইন্সট্রাক্টর এট্টা বার্ডের সহায়তায় তিনি ভর্তি হন আইওয়া স্টেট কলেজ অব অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড মেকানিক আর্টসে (বর্তমানে আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি)। সেখান থেকে তিনি ১৮৯৪ সালে কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক লাভ করেন। এর দুই বছর পরে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল - 'প্লান্টস এজ মডিফাইড বাই ম্যান'। এতে তিনি বিভিন্ন ধরনের বরই ও জেরানিয়াম গাছের ক্রস প্রজনন গবেষণার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

কৃষ্ণাঙ্গ কৃষিবিদ

স্নাতক ডিগ্রি লাভের পরপরই তিনি স্টেট অ্যাগ্রিকালচার ইনস্টিটিউট কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। কার্ভার হচ্ছেন স্টেট অ্যাগ্রিকালচার ইনস্টিটিউটের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ফ্যাকাল্টি সদস্য। সেখানে তিনি সিস্টেমিক বোটানি বিভাগে ব্যাকটেরিয়া গবেষণার নেতৃত্বে ছিলেন। আইওয়াতে তাঁর কর্মের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে শিক্ষা ও গবেষণার কাজে আলাবামা অঙ্গরাজ্যে চলে যান। তিনি ১৮৯৬ সালে সেখানে টাসকিগি ইনস্টিটিউটের (বর্তমানে টাসকিগি ইউনিভার্সিটি) পরিচালক হিসেবে যোগ দেন।

শস্য আবর্তন

শস্য আবর্তনের মাধ্যমে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি, জৈব সার ব্যবহার ও উদ্ভিদের উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানে কার্ভার তাঁর সময়কালের চেয়ে অগ্রবর্তী ছিলেন। টাসকিগিতে কর্মজীবনের শুরুতেই কার্ভার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেন যে দক্ষিণের তুলাকেন্দ্রিক এক ফসলি ক্লান্তিময় পুরোনো মাটির কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। আর রাসায়নিক সারের যে খরচ, তা নির্বাহ করার সামর্থ্য দক্ষিণের গরিব চাষিদের ছিল না। কার্ভার রাসায়নিক সার ব্যবহার ছাড়াই যথাযথ কৃষিচর্চা এবং প্রচলিত শস্যগুলোর সাথে বরবটি ও শিমের মতো মৃত্তিকা সমৃদ্ধকারী উদ্ভিদের শস্য আবর্তনের মাধ্যমে নাটকীয়ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। আবার, বল উইভিল পতঙ্গের আক্রমণে তুলা শস্যের বিনাশ ঘটলে চাষিদের জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ। তাই তুলার বাইরে মিষ্টি আলু, প্রোটিনসমৃদ্ধ শস্য সয়াবিন, বাদাম উৎপাদনে কৃষকদের সম্মত করতে তিনি গবেষণাগারে এগুলোর রকমারি ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করেন।

বাদাম মানবের উদ্ভাবন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শস্য ও খাদ্যস্বল্পতা দেখা দেয়। কার্ভার তখন মিষ্টি আলু, সয়াবিন ও চিনাবাদামের বিকল্প ব্যবহার উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। তবে এগুলোর মধ্যে চিনাবাদাম গবেষণা কার্ভারকে বিখ্যাত করে তোলে। তাঁর নাম হয়ে যায় 'বাদম মানব'। সে সময় চিনাবাদামকে মূলত গবাদিপশুর খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হতো। প্রোটিনের উৎস বাদামের প্রতি কার্ভারের আকৃষ্ট হওয়ার কারণ ছিল- এটি সহজে চাষ করা যায়, মাটিকে সমৃদ্ধ করে (নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে); একটি বিশেষ বিবেচনা এটা অবশ্যই ছিল যে গরিব কৃষ্ণাঙ্গ চাষিদের মাংস ক্রয় করার সামর্থ্য ছিল না। চিনাবাদাম থেকে তিনি বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করেন। যাতে ছিল দুধ, প্লাস্টিক, সিনথেটিক রাবার ও কাগজ। রোগ চিকিৎসায় ঔষধি চিনাবাদাম তেলও তৈরি করেন। তাঁর উদ্ভাবিত বাদাম দুধ ছিল অসংখ্য আফ্রিকান শিশুর জীবনদায়ী খাদ্য, বিশেষ করে যেসব শিশুর মা সন্তান জন্মদানের সময় মৃত্যুবরণ করেছে (লুণ্ঠনকারীদের ভয়ে কিছু এলাকায় গরুর দুধ দোয়ানো সম্ভব ছিল না)। বাদাম নিয়ে কার্ভারের কাজ ও বাদামভিত্তিক উদ্ভাবনগুলো দক্ষিণের পল্লি অঞ্চলে ও জর্জিয়ার বাদামশিল্পে অবদান রাখার মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশে ভূমিকা রাখে। আমেরিকার কৃষিতে তাঁর প্রভাব ছিল বিস্তৃত ও গভীর।

খাবার, কাপড় তৈরি ছাড়াও যে উদ্ভিদের আরো নানা রকম ব্যবহার হতে পারে, তা নিয়ে তিনি অভিনব সব গবেষণা করেছেন। সার্বিকভাবে তিনি চিনাবাদাম থেকে ৩০০ সামগ্রী ও মিষ্টি আলু থেকে ১১৮টি সামগ্রী উদ্ভাবন করেন। সয়াবিন থেকে তিনি রং ও রঞ্জক পদার্থ তৈরির প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। এছাড়া বর্জ্য পদার্থ

থেকে পুনঃব্যবহারযোগ্য তেল এবং কাদা থেকে রং ও রঞ্জক প্রস্তুত করেন। গাড়ি প্রস্তুতকারক হেনরি ফোর্ডকে তিনি উদ্ভিদভিত্তিক বিকল্প প্রাকৃতিক রাবার প্রস্তুতে সহায়তা করেন।

কার্ভারের বিভিন্ন সিনথেটিক উদ্ভাবনের মধ্যে রয়েছে অ্যাডহেসিভ, চাকার গ্রিজ, শুভ্র করার উপাদান, চিলি সস, কাষ্ঠবারক, ডাই, ময়দা, মুখে মাখার ক্রিম, কাঠের রঞ্জক, অন্তরক বোর্ড, মাংস নরমকারক, ধাতব পলিশ, মিল্ক শেক, মৃত্তিকা কন্ডিশনার (মাটির ভৌত গুণাগুণ উন্নয়নকারক)। তাঁর অসংখ্য উদ্ভাবনের মধ্যে মাত্র তিনটির প্যাটেন্ট হয়েছিল। কারণ তিনি চাইতেন তাঁর গবেষণা মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হোক, গুটিকয়েকের লাভের বদলে সবাই উপকৃত হোক।

একজন শিক্ষক ও ভ্রাম্যমাণ কৃষি স্কুল প্রতিষ্ঠা

কার্ভার দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ কৃষক নির্বিশেষে সবার জন্য টেকসই কৃষিপদ্ধতির বিষয়ে শিক্ষাদানে কাজ করেছেন। তাঁর গবেষণাগারে পুঁথিগত বিদ্যার তেমন স্থান ছিল না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে 'ট্রায়াল ও এরর' প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের তাঁদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করতেন। কার্ভার অনুধাবন করলেন সাধারণ মানুষ সবচেয়ে ভালোভাবে শিখতে পারবে, যদি প্রত্যক্ষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের হাতেকলমে দেখানো যায়। তাই সপ্তাহান্তে তিনি অশ্বচালিত একটি শকট চালিয়ে আলাবামার পল্লি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ স্কুল চালনা করতেন। পরে ১৯০৬ সালে নিজের করা নকশায় জেসাপ কৃষিযান নামক চার চাকার একটি ওয়াগন স্থাপন করেন। জেসপের দেওয়া অনুদান থেকে নির্মিত হয় বলে এর নামকরণ করা হয় 'জেসাপ ওয়াগন'। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতিগুলোর সাথে আলাবামার পল্লি এলাকার মানুষদের সংযোগ ঘটানো এবং হাতেকলমে আধুনিক কৃষিপদ্ধতি শেখাতে এটি নির্মিত হয়। স্থানীয় মানুষজনের কাছে এই চাকার স্কুল ব্যাপক সমাদর লাভ করে। ভ্রাম্যমাণ স্কুলটি কৃষকদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। কার্ভারের এই দৃষ্টান্ত পরবর্তী সময়ে চীন ও ভারতেও বাস্তবায়িত হয়।

উদ্ভিদ চিকিৎসক থেকে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ

শৈশবে পালক মাতা সুসান কার্ভারের সাথে কার্ভার বাগানে কাজ করতেন। প্রকৃতিতে বিরাজমান বিভিন্ন উপাদানের বিষয়ে জানতে ও খুঁজতে তাঁর ছিল সীমাহীন আগ্রহ। তিনি উদ্ভিদ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। ডায়ামন্ড মিসোরিতে খুব শিগগির তিনি 'উদ্ভিদের চিকিৎসক' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। প্রতিবেশীরা প্রায়ই তাদের রোগাক্রান্ত দুর্বল ফুলগাছ ও উদ্ভিদের সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে কার্ভারের কাছে ছুটে আসত।

তারপর আইওয়া স্টেট কলেজে পড়াশোনাকালীন অধ্যাপক ড. লুইস এইচ পামেল দ্বারা কার্ভার খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন। ড. পামেল উদ্ভিদের রোগ, বিশেষ করে ছত্রাকঘটিত রোগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ড. পামেল কার্ভার সম্পর্কে বলেছিলেন, "বিভাগের মধ্যে কার্ভার হচ্ছে আমার দেখা এ পর্যন্ত রোগ নমুনার সেরা সংগ্রহকারী।' ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের দিকে ব্যুরো অব প্লান্ট ইন্ডাস্ট্রির অনেক ছত্রাকবিদের সাথে কার্ভারের যোগাযোগ ছিল। ছত্রাকবিদেরা উদ্ভিদের রোগ শনাক্ত করে তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পাঠাতেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্রে থেকে ছত্রাকঘটিত রোগসৃষ্টিকারী নমুনা সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করেন। ছত্রাক নমুনা সংগ্রহে তাঁর সক্রিয়তা দেখে টাসকিগিতে দায়িত্ব

পালনরত অবস্থায় ব্যুরো অব প্লান্ট ইন্ডাস্ট্রির উদ্ভিদ ছত্রাক ও রোগ জরিপ বিভাগ ইএসডিএ–তে সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কার্ভারের সংগৃহীত রোগ নমুনাগুলো বর্তমানে ইউএস ন্যাশনাল ফান্ডাশ কালেকশন সংরক্ষিত আছে। বেশ কিছু নতুন প্রজাতির ছত্রাক জর্জ কার্ভারের নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন– *Metasphaeria carveri, Cercospora carveriana, Pestalotia carveri* ।

নিজ শিকড়কে না ভোলা এক কালো মানুষ

শিক্ষার্থী, সহকর্মী ও যাদের সাথে মিশতেন, সবার কাছেই কার্ভার ছিলেন প্রিয় ব্যক্তিত্ব। জীবনে বিভিন্ন স্থান থেকে চাকরির প্রস্তাব পেয়েছিলেন। যার মধ্যে ছিলেন টমাস আলভা এডিসনও। যখন টমাস এডিসন বছরে ১ লাখ ডলার অর্থের বিনিময়ে তাঁর গবেষণাগারে এসে কাজের প্রস্তাব দেন, কার্ভার ১ হাজার ডলার বেতনে আলাবামার টাসকিগিতেই থেকে যান। কারণ তাঁর মনে ছিল জ্ঞাতিভাইদের কথা, যাদের জন্য অনেক করণীয় রয়েছে। তাই কাজ করেছেন তাঁর গবেষণাগারে, প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন দক্ষিণের হতদরিদ্র কৃষকদের দারিদ্র্য লাঘবে। চেষ্টা করেছেন তাঁদের স্বনির্ভর করে তুলতে। এবং শিক্ষাদান করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের কৃষিবিজ্ঞানীদের।

প্রচারক

তিনি সহজবোধ্য ভাষায় ৪৪টি কৃষি বুলেটিন রচনা করেন। বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত এসব বুলেটিনের বিষয়বস্তুর পরিসর ছিল পশুসম্পদ থেকে অর্থনীতি, শস্যের রোগ দমন কৌশল থেকে কৃষকের দৈনিক তিন বেলা খাবার। লেখা, অক্ষরবিন্যাস, সম্পাদনা ও ছাপার কাজ সব তিনি প্রায় একাই করতেন। কৃষকদের অবস্থা দেখতে নানা প্রান্তে ছুটে যেতেন ও চাষিদের সমাবেশে বক্তৃতা দিতেন। তিনি কখনো বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অর্থ গ্রহণ করেননি।

বিদায় বেলা

কার্ভার আমৃত্যু মাসিক ১২৫ ডলার বেতনে টাসকিগিতে কাজ করেছেন। ১৯৪২–এর শেষের দিক থেকে তার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। ১৯৪৩ সালের ৫ জানুয়ারি নিজ কর্মস্থল টাসকিগি ইনস্টিটিউটে প্রয়াত হন এই কালো মানুষটি। মৃত্যুর পর তাঁর সমুদয় সঞ্চয় মাটির উর্বরতা ও বর্জ্য পদার্থ থেকে ব্যবহারোপযোগী উদ্ভাবনবিষয়ক গবেষণার জন্য টাসকিগি ইনস্টিটিউটে দান করা হয়।

সম্মাননা

কার্ভার বিভিন্ন পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তিনি স্পিনগান মেডেল (১৯২৩) ও রুজভেল্ট মেডেল (১৯৩৯) পেয়েছেন। তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু ডকুমেন্টারি নির্মাণ হয়েছে। এমনকি 'লাইফ অব জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার' নামে হলিউডে মুভিও নির্মিত হয়েছে।

প্রবন্ধকার : অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭

জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনের সময়সূচি

রোববার থেকে বুধবার
(সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা)
শুক্রবার (দুপুর ২টা ৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭টা)
শনিবার (সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা)
বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

- জাদুঘরে রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার অনেক প্রদর্শন-বস্তু এবং আধুনিক লাইব্রেরি
- শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশের নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ দেখা যাবে
- আরও রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মিউজিয়াম বাস ও 4D মুভিবাস

অনলাইনে নিম্নোক্ত লিংকে টিকিট পাওয়া যাবে

http://nmst.sobticket.com/

https://www.facebook.com/nmstbdpg/

বিস্তারিত তথ্য পেতে
যোগাযোগ করুন
www.nmst.gov.bd
e-mail: infonmst@gmail.com

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ফোন: ০২-৫৮১৬০৬১২, ০২-৫৮১৬০৬১৬
মোবাইল: ০১৩০৯-৩১৩০৬১